চতুর্থ অধ্যায়

বিষয়ভিত্তিক উপন্যাসগুলির নিবিড় পাঠ

স্বর্ণকুমারী দেবীর জন্ম, বেড়ে ওঠা, সাহিত্যচর্চা এমন একটি সময়ে যখন বাংলার সমাজ এবং সাহিত্যে 'নারী' ছিল একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা নিবারণ থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ আইন, স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন— সবকিছুর মধ্য দিয়ে সে যুগের চিন্তাবিদরা নারীব্যক্তিত্ব উন্মোচনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই নতুন পথের সৃষ্টি ও বিস্তারকে শুরু থেকে লক্ষ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব ভাবনা ও সৃষ্টিধর্মী কর্ম।

> অবরোধপ্রথা বিলোপের আয়ুধ নিজ পরিবারের মধ্য থেকেই পেয়েছিলেন, উপরন্তু অভিজ্ঞতার ব্যাপকতার সাহায্যে মানুষের, বিশেষত নারীদের সমকালের লাঞ্ছনার ইতিবৃত্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই জানা, এই সাধনা বিফলে যায়নি, বিচিত্র রচনা তাঁর লেখনীপ্রসূত হয়ে ধরা দিয়েছিল, যা তাকে প্রাগ্রসর শিল্পীর মহিমা দিয়েছিল। তাঁর উপন্যাসের নারী-ভাবনার প্রসঙ্গে তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা, তাঁর পরিবারগত শিক্ষা, ব্যক্তিগত শিক্ষা তাঁকে আলাদা ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল।[১]

ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়েই স্বর্ণকুমারী তাঁর ঔপন্যাসিক জীবন শুরু করেছিলেন। প্রথম উপন্যাস 'দীপ-নির্ব্বাণ' (১৮৭৬) এ তাঁর লেখনীর গভীরতার ছাপ স্পষ্ট ধরা পড়েছিল।

> At a very early age Mrs. Ghosal... showed unusual ability and force of character; before she was twenty she had published an anonymous novel which became an immediate success, and the revelation of its authorship caused a great sensation, as it was the first time an Indian woman had attempted such a feat.[২]

দীপ-নির্বাণ উপন্যাসের মূল বিষয় হল স্বদেশপ্রেম। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবোধ এবং পরাধীনতার উপলব্ধি থেকেই এই স্বদেশচেতনা সঞ্জাত।

> আমাদের বাড়ির সাহয্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়।[৩]

হিন্দুরাজাদের অন্তর্কলহের সুযোগে স্থানেশ্বরের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হাতে পৃথ্বীরাজের পরাজয় এবং ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের পটভূমিতে 'দীপ-নির্ব্বাণ' উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। উপন্যাসের উপক্রমনিকায় লেখিকা উপন্যাসের যে প্রমাণভিত্তিক আলোচনা করেছেন তা তাঁর ইতিহাসনিষ্ঠতার পরিচয় দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাস থেকে সরে এসেছেন।

> ইতিহাস এবং উপন্যাস এক বস্তু নহে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত স্থান সাহিত্যের শ্রেণীতে, ইতিহাসের শ্রেণীতে নহে।... ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা সার্থকতা আছে; তাহার কারণ, সত্য ইতিহাসের মধ্যে কি-যেন-একটা অভাব বোধ হয়; অর্থাৎ অতীত যুগের মৃত নায়ক-নায়িকাগণ তাহাদের প্রায় সব গোপনীয় ব্যাপারগুলি সঙ্গে লইয়া তিরোধান করিয়াছেন, এবং আধুনিকেরা অতীত যুগকে চিরদিনই শুধু ভাঙা ভাঙা রকমে চিনিতে পারে। পাঠক হৃদয়ের এই শূন্যস্থান ঐতিহাসিক উপন্যাস পূরণ করে।[৪]

উল্লেখ্য যে, উপন্যাসটির পরিকল্পনায় ও ঐতিহাসিক তথ্যের ব্যবহারে টডের Annals and Antiquities of Rajasthan এবং চন্দবরদাইর 'পৃথ্বীরাজ রাসো' আকরগ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়েছিল। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ দুইটিতে জাতীয়তাবোধ প্রধান্য পায়নি।

> নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র স্পৃহার দ্বারা তাঁর বর্তমান উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবিন্যাস কৌশল যে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।[৫]

উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যেও স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং আত্মদান লেখিকার সচেতন মনের পরিচায়ক। যুদ্ধযাত্রাকালে রাজমহিষী পৃথ্বীরাজকে বলছেন—

> দেব, তুমি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঁচিয়া থাক এরূপ কামনা আমি করিনা। তবে তুমি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র মরিতে পারিব না, মনে এইমাত্র খেদ থাকিবে।[৬]

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে স্বর্ণকুমারী দেখেছিলেন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের আড়ালে বন্দিনী নারীর উপর অন্যায় অবিচার। তাঁর অনেক গল্প উপন্যাসে মেয়েদের উপব অন্যায় অত্যাচারের প্রতিচ্ছবিকে তুলে দেখিয়েছেন লেখিকা। উনিশ শতকের নারী-আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। সখিসমিতি, মহিলা শিল্পমেলা, প্রভৃতি বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে তিনি মেয়েদের পথ দেখিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন দেশের মুক্তির কাজে মেয়েরাও এগিয়ে আসুক। পৃথ্বীরাজ মহিষীর মধ্য দিয়ে তাঁর এই ভাবনাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন লেখিকা।

যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের বন্দি হওয়ার খবর শুনেও রাজমহিষী ভেঙে পড়েননি। এমনকী আত্মরক্ষার জন্য রাজপুত রমণীরা যে জহরব্রত পালন করতেন, তাও তিনি করেননি। রাজমহিষীকে দেখা যায় মোঘল সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে হিন্দু সেনাদের নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে। যুদ্ধ করতে করতে বীরনারীর মতো মৃত্যুবরণ

করেছিলেন তিনি। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রেক্ষাপটে রাজমহিষীর এই আত্মদান পাঠকচিত্তকে অভিভূত করে। ভারতবর্ষের নিগৃহীতা নারীর সম্মুখে রাজমহিষীকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাতে চেয়েছিলেন লেখিকা।

উপন্যাসটির অন্যান্য নারীচরিত্রগুলির মধ্যেও এই স্বদেশভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে প্রভাবতী চন্দ্রপতির উদ্দেশ্য বলছেন—

> তুমি স্বদেশ রক্ষার জন্য যাচ্ছ আমি তাতে বাধা দেব না। ঈশ্বর করুন আরবারের মত কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসো।[৭]

আবার অষ্টম পরিচ্ছেদে খল কাপুরুষ বিজয় সিংহকে উদ্দেশ্য করে রাজকুমারী ঊষাবতীকে বলতে শোনা যায়—

> তোমার মত আমি স্বদেশ অপেক্ষা প্রাণকে অধিক মূল্যবান মনে করিনা।[৮]

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী কল্পনার সঙ্গে রাজপুত মারাঠা ও শিখের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের পটভূমিকায় স্বর্ণকুমারীর মতো সচেতন শিল্পির সৃষ্টির মধ্যে এই স্বদেশপ্রীতির কথা থাকা খুব স্বাভাবিক।

অন্যদিকে উনিশ শতক হল আত্মদ্বন্দ্বের যুগ। প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার টানাপোড়েনে এইসময় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে আত্মদ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'দীপ-নির্ব্বাণ' উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্যে স্বদেশচেতনার স্ফুরণ যেভাবে লক্ষ করা যায় অন্যদিকে এই নারীদেরই পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের কাছে অবনমিত হতে দেখা যায়। রাজকুমার কল্যাণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা মুমূর্ষু ঊষাবতী স্বপ্নে কল্যাণকে ক্ষমা চাইতে দেখে বলে—

> আমি কি তোমাকে ক্ষমা করিবার যোগ্য? তুমি কি দোষ করিয়াছ যে আমি তাহার জন্য তোমার উপর অভিমান করিব? তবে তুমি ক্ষমা চাহিতেছ কেন? আমি তোমার কোন দোষ জানিনা। তুমি আমার হৃদয়ের দেবতা। দেবতা যাহা করেন কিছুই দোষের নহে।[৯]

পিতৃতান্ত্রিক পরিসরে নারীর ভাষা পুরুষের দ্বারা অধিকৃত। ঊষাবতীর এই উক্তির মধ্যে নারী যে চিরকাল পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট তা-ই বুঝিয়ে দেয়।

উপন্যাসে ঊষাবতী চরিত্রটি অনেকটাই নির্জীব এবং প্রাণস্পন্দনহীন। তাঁর মধ্যে ব্যক্তিত্বের কোনো বিকাশ লক্ষিত হয় না। পুরুষতন্ত্রের ছায়ায় সে আবিষ্ট থেকেছে। যুবরাজ কল্যাণের প্রেম প্রত্যাখ্যানের পরও তাঁর কোনো ভাববৈচিত্র্য বা অন্তর্দ্বন্দের প্রকাশ হয়নি, সংজ্ঞালোপ ছাড়া। ঊষাবতী চরিত্র পরিকল্পনায় লেখিকা রোমান্স নায়িকার বৈশিষ্ট্যকেই অনুসরণ করেছেন।

উপন্যাসে লেখিকা কল্যাণ সিংহকে ঊষাবতীর প্রতি সমান অনুরাগী করে দেখিয়েছেন। কিন্তু কল্যাণ সিংহ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষ হওয়ায়, এই সমাজ মানসিকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারেনি। ঊষাবতীর নিষ্পাপ মুখের দিরে চেয়ে তাকে নিষ্কলঙ্ক ভাবতে পারেনি। ঊষাবতীকে সে বলেছে—

> হাঁ, তুমি সতী! তাই বিজয়কে প্রণয়োপহারস্বরূপ অঙ্গুরী প্রদান করিয়াছিলে? তুমি সতী! তাই তাহাকে ভালবাসিয়াও আমাকে স্বামীরূপে বরণ করিতে উদ্যত ছিলে?

> পাপীয়সী! তুমি কেবল দুশ্চরিত্রা হইয়াও ক্ষান্ত হও নাই। কুহকিনীর ন্যায় মিথ্যা প্রণয়পাশে আমাকে বদ্ধ করিয়াছ। তুমি দুশ্চরিত্রা জানিয়াও আমি সে বন্ধন ছিঁড়িয়ে ফেলিতে পারিতেছি না। জন্মের মত আমার সুখ বিলুপ্ত হইল উঃ, আমি কি মুগ্ধ হইয়াছিলাম...[১০]

নারীকে বিশ্বাস করা যায় না এই ধরাণাই এখানে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় নারী অপহৃত হলে, ধরে নেওয়া হয় যে তাঁর চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এই ধারণা আজও সমাজে প্রচলিত।

স্বর্ণকুমারী রচিত দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মিবাররাজ' (১৮৮৭)। উপন্যাসটি আকারে ছোট। তবে উপন্যাসের প্লট এমনভাবে সাজানো হয়েছে যার ফলে উপন্যাসের গতিবেগ কোথাও ব্যাহত হয়নি।

উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল রাজপুত ও ভীলদের জাতিগত বিরোধ। উপন্যাসটিতে আরণ্যক মানুষের সরলতা, আতিথেয়তা এবং অনাড়ম্বর জীবনধারাকে তুলে দেখিয়েছেন লেখিকা। রমেশচন্দ্র দত্তের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' উপন্যাসেও ভীল-রাজপুত জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাজপুতদের জীবনকথা অসাধারণত্বে মন্ডিত হয়নি। স্বর্ণকুমারীর উপন্যাসে আদিবাসীদের জীবনের হাসি, কান্না, সুখ-দুঃখের চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভীলদের সংলাপে লেখিকা আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করে গভীর বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এই উপভাষার প্রয়োগের মধ্যে আদিম জাতির প্রাণ স্পন্দন সজীব হয়ে উঠেছে।

> স্বর্ণকুমারী একটি সুনির্দ্দিষ্ট সমস্যাকেন্দ্রিক নাট্যরীতির গল্পে জাতীয় জীবনের প্রতিফলিত রূপ দেখাতে চেয়েছেন।[১১]

ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে উপন্যাসটি মৌলিক হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মানসিকতায় ভারতীয় ভাবনার প্রধান্য লক্ষ করা যায়। 'মিবাররাজ' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারীর প্রাচীন ভারতীয় জীবনপ্রীতি স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

খুব সাধারণ কারণও মানুষের জীবনকে যে করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে এই সূত্রটিকে অবলম্বন করেই লেখিকা উপন্যাসটিকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। মিবার রাজবংশের সূচনাপর্বের কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে উপন্যাসে। ভীলরাজ মন্দালিক, তাঁর পুত্র তালগাছ ও তাঁর বন্ধু গুহা এই তিনটি চরিত্রের উত্থান, পতন এবং বিকাশের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের ঘটনাবলি আবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখিকার লেখনি ভঙ্গিমা অনেক স্বচ্ছন্দ ও পরিণত। উনিশ শতকের উপন্যাসের অন্তর্দেশীয় ইতিহাস থেকে মুসলমান এবং হিন্দুর জয়-পরাজয়ের কাহিনি অধিক প্রচলিত ছিল ও সেইসঙ্গে রোমান্সের আবহে নর-নারীর প্রণয়কাহিনি ঘণীভূত হয়েছিল। কিন্তু 'মিবাররাজ'-এর কাহিনি প্রণয়কথা বর্জিত। উপন্যাসে রাণী পুষ্পবতী, কমলাবতী ও সত্যবতী এই তিনটি রমণী চরিত্র আছে। তবে তিনটি চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না।

টডের গ্রন্থে আছে যে মহারাজ শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রবতীতে অম্বাভবানীর মন্দিরে ভাবী সন্তানের মঙ্গল কামনায় পুজো দিয়ে ফেরার পথে লোকমুখে রাজা শিলাদিত্যের মৃত্যু সংবাদ পান। পর্বতগুহায় পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করে তিনি প্রাণ বিসর্জন করেন।

> ...Taking refuge in a cave in the mountains of Mallia, she

was delivered of a son. Having confined the infant to a Brahminee of Birnugger named Camlavati, enjoying her to educate the young Prince as a Brahmin, but to marry him to a Rajpootnee, she mounted the funeral pile to join her lord...[১২]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাজকাহিনি'তে 'গোহা' নামক গল্পে টডকেই অনুসরণ করেছিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশীজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত রাণী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখতে-দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল।[১৩]

কিন্তু মিবাররাজ উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন—

...অল্পক্ষণের মধ্যে সেই গুহাতেই রাণীর সন্তান জন্মিল, নবশিশুকে কমলাদেবীর হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন, পর্ব্বতেই তাহার অগ্নিকার্য্য সমাধা হইল।[১৪]

রাজপুতের মধ্যে জহরব্রত প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশেও উনিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহরোধ আইন স্বীকৃত হবার পর মেয়েরা পুড়ে মরার হাত থেকে আইনি সুরক্ষা পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত যুক্তিবোধ বাঙালির মননকে প্রভাবান্বিত করেছিল। মনে হয়, স্বর্ণকুমারী তাঁর উপন্যাসে পুষ্পবতীর মৃত্যুকে অগ্নিতে আত্মাহুতি না দেখিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুই দেখিয়েছেন।

পালিকা মা কমলাবতীর স্নেহ-মমতা এবং সন্তানস্নেহে গুহাকে প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে চিরকালের মাতৃহৃদয়ের সুধাময় রূপটিই প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। গুহা ও সত্যবতীর মধ্যে ভ্রাতা-ভগ্নির মধুর সম্পর্ক স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের ভ্রাতা-ভগ্নির সম্পর্কের কথা মনে করায়। দুই দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণা স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যচর্চা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। তাঁর অনেক উপন্যাসেই ভাই-বোনের স্নেহ সম্পর্ক ফিরে ফিরে এসেছে।

'দীপ-নির্ব্বাণ' এবং 'মিবাররাজ' রচনার পর 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮) উপন্যাসে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অনেক সমালোচক উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে মানতে রাজি হননি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে উপন্যাসটিকে সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিজিতকুমার দত্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থটিতে আলোচনাকালে গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে অস্বীকার করেও আলোচনা থেকে বাদ দিতে পারিননি। সত্যেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন—

ইতিহাস হল অতীতের ঘটনাপ্রবাহ এবং পুরা-ঘটিতের সমগ্রতা; তাছাড়াও ইতিহাসের অন্তর্গত হল অতীতজ্ঞান বা অতীত ঘটনাজ্ঞান, অতীতের চিন্তা অথবা তৎসম্পর্কিত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান, এবং অভিনব তথ্যের সঙ্গে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের অন্বয়সাধন তথা

> অতীতের পুনর্গঠন, ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের স্রষ্টা এতদুভয়ের সমন্বয় সাধনেচ্ছুক হতে পারেন, তদ্ব্যতীত এদতিরিক্ত কিছুর অবকাশ থাকতেই পারে। সে যা হোক ব্যাপক অর্থেও সার্থক উপন্যাস মাত্রই ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে গৃহীত হতে পারে। 'ভ্যালু-সচেতন ইতিহাসগত মানুষের জন্য সংগ্রাম, এর মধ্য দিয়ে মানবজীবনের যে রূপবৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, সে রূপ অগভীর ত্বকের নয়, গভীর মর্মের', ঐতিহাসিক উপন্যাস সেই রূপকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অন্য উপন্যাস যদি তাই করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে অন্যজাতীয় নয়, সেও ঐতিহাসিক। সেই অর্থে সমস্ত সার্থক উপন্যাসই অল্পবিস্তর ঐতিহাসিক সজ্ঞানে অথবা অলক্ষ্যে।[১৫]

মধ্যযুগের অন্তিমলগ্নে ভাগীরথী তীরবর্তী জনপদ, মুসলমান শাসনের শেষপর্বের রাজনৈতিক পরিবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে হুগলীর গৌরবময় স্থান, তার সামাজিক পরিস্থিতির আড়ালে হুগলীর জীবন প্রবাহের দুর্নীতি ও বিলাসিতা — এই ইতিহাসই উপন্যাসটির পটভূমি। তবে 'হুগলীর ইমামবাড়ী' উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য থেকেও গুরুত্ব পেয়েছে লেখিকার গভীর আদর্শবোধ।

> ...'হুগলীর ইমামবাড়ী' আদর্শবাদী ধর্মসাধিকা স্বর্ণকুমারীর সৃজিত। তাঁর বক্তব্য হল এই পার্থিব জীবনের স্বল্পস্থায়ী ভোগবিলাস সুখ-সম্পদ বা দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে মানুষ জীবনের বৃহত্তর যে লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হয় সে লক্ষ্য হল নিরাসক্ত নির্মোহ জীবনসাধনা। সেই সিদ্ধিতে পৌঁছনর জন্যই মানুষের মর্ত্যের এই ক্ষণিক সুখ-দুঃখ ভোগ। তবে মানুষ এই ভোগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে গীতার নির্দিষ্ট নিষ্কাম কর্মের দ্বারা।[১৬]

উপন্যাসে মসীন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখিকা ভারতীয় ধর্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেছেন। একটি সম্মুন্নত জীবনাদর্শে মসীন দীক্ষিত। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে সে জীবনের সমাধান খুঁজে পেয়েছে।

> এই পর্যায়ে লেখিকা তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আদর্শ জীবনের সন্ধান করে চলেছিলেন। সমকালীন ঐতিহাসিক সামাজিক সর্ববিধ রচনার মধ্যে তার প্রমাণ বিদ্যমান।[১৭]

উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র মহম্মদ মসীন হলেও মসীনের বোঝ মুন্নার জীবন-যন্ত্রণা এবং তার উত্তরণের মুক্তিপথের সন্ধান উপন্যাসটিতে গুরুত্ব পেয়েছে। দৃঢ় মানসিক বলের আধিকারিণী মুন্না কঠিন জীবনসংগ্রামের মধ্যে দাঁড়িয়েও অবিচল থেকেছে। স্বামীই যে মেয়েদের একমাত্র অবলম্বন, মুন্নার মধ্য দিয়ে লেখিকা বাঙালি নারীর জীবনচিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মুন্না তাঁর সব টাকা-পয়সা স্বামীকে বিলিয়ে দেয়। লম্পট মাতাল স্বামী তাঁর দেবতা। এই রক্ষণশীল ভাবনাই ভারতীয় নারীর চেতনা জগতকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মসীনের প্রশ্নের উত্তরে মুন্না তাই বলেছে —

> ভাই, যার ধন তিনি এরূপ করিলে আমার কি হাত? আমি কে?[১৮]

মেয়েদের নিজস্ব জগতের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ ছিল পতিভক্তি। স্বামীর কাছ থেকে নিরন্তর অবহেলা অপমান পেয়েও মেয়েদের কাছে পতি পরমগুরু বলেই বিবেচিত হত। স্বামী পরিত্যক্তা মুন্না সেজন্যই ভালবাসা

বলতে বোঝে আত্মসমর্পণ। মসীনের ক্রোধের উত্তরে সে বলে—

> তাঁর কেন দোষ দাও ভাই, তিনি কি করিবেন মসীন? তিনি আগে কত ভাল ছিলেন,
> সব কি ভুলিয়া গিয়াছ? স্বামীর ভালবাসা আমার মত কয়জন স্ত্রী পাইয়া থাকে?
> আমার নির্বুদ্ধিতাতেই সমস্ত হারাইয়াছি, দোষ আমারি,...[১৯]

সমাজ একদিকে পুরুষদের দিয়েছে অবাধ প্রশ্রয়, অন্যদিকে নারীদের গড়ে তুলেছে ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্যের প্রতিমূর্তি করে। পিতৃতান্ত্রিক পরিসর নারীর মস্তিষ্ক বুদ্ধি সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তার ফলে নিজের সত্তা সম্পর্কে নারীর কোনো চেতনা জেগে ওঠে না।

> পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ নিরঙ্কুশ কারণ নারীর শরীরে ও মনে, ভাষায় ও চেতনায়, দৃষ্টিকোণ ও ব্যবহারে পুরুষের আধিপত্যবাদী কৃৎকৌশলের সুনিবিড় ছায়া। নারীচিত্ত শুধু যে সাধারণভাবে তা মেনে নিয়েছে, তা-ই নয়; এর কোনো ব্যতিক্রমের আভাসমাত্র দেখলে সত্তার চারদিকে ঝাঁপ ফেলে দিচ্ছে। পুরুষের ভাষা চেতনা, মূল্যবোধের দ্বারা অধিকৃত হওয়াতে তার যে নিজস্ব পরিসর বলতে কিছু নেই কোথাও, এ ব্যাপারে সচেতনতা শূন্য।[২০]

তবে স্বামী সলেউদ্দিন তাকে ত্যাগ করে যাবার পর নবাব খাঁ জাহান খাঁর বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে মুন্না চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নাকে সে বলেছে—

> তাঁহাকে বলিও, এখনো গঙ্গার বুকে আমার আশ্রয় আছে।[২১]

মুসলমান প্রথানুযায়ী বহুবিবাহ স্বীকৃত। মুন্না ইচ্ছে করলেই খাঁ জাহানের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সমস্ত সুখ, ঐশ্বর্য, বিলাসিতাকে প্রত্যাখ্যান করে সে তাঁর আদর্শে অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দু নারীর সমস্যা নিয়ে যতটুকু আলোড়ন হয়েছিল সমাজে মুসলমান নারীর অবস্থান সম্পর্কে কিন্তু সেভাবে আন্দোলন গড়ে উঠেনি। রক্ষণশীল গোঁড়া মুসলমান সমাজ ও জীবন সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকায় তখন মুসলমান সমাজ-সাহিত্যে বিস্তৃতি লাভ করতে পারেনি। সেইসময় একজন মুসলমান রমণীর জীবন সমস্যাকে লেখিকা যেভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তা সে সময়কার অনেক লেখকই সাহস করেননি। ঠাকুরবাড়ির মুক্ত উদার পরিবেশ স্বর্ণকুমারীর চিত্তে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে সম্প্রীতির চেতনা গড়ে তুলেছিল। সেজন্য মুন্নার সমস্যাকে লেখিকা একজন নারীর সমস্যা করেই বিচার করেছেন।

> স্বর্ণকুমারী দেবী মুসলমান সমাজের চিত্র অঙ্কনে সাহসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থক না হলেও প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয়।[২২]

মুন্নার মধ্যে হিন্দু নারীর পাতিব্রত্যের আদর্শ ফুটে উঠেছে। তাঁর চরিত্রে ব্যক্তিত্বের কোনো বিকাশ হয়নি। স্বামীর ভালবাসা পাওয়ার জন্য সে সারা জীবন কষ্ট করে গেছে। কিন্তু নিজের প্রাপ্য অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেনি। কারুর প্রতি তাঁর কোনো অভিযোগ নেই, নিজের জীবনের দুঃখকে সে অদৃষ্টের বিধান বলে মেনে নিয়েছে। কারণ যুগ যুগ ধরে নারী জেনে এসেছে প্রেম আর আত্মবিলুপ্তি সমার্থক।

'নারী' এবং তাঁর বিভিন্ন প্রতিশব্দের ব্যুৎপত্তিতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার পরনির্ভরতা,

> তার সেবাপরায়ণতা, তার লতার মত বেষ্টনশীলতা, এক কথায় তার অসম্পূর্ণতা। তাকে পূর্ণ করে তোলার দায় পুরুষের। বলা বাহুল্য, ভাষা ও চেতনার এই লৈঙ্গিক চিহ্নায়ন পুরুষেরই অবদান। আজ নারী বহু হাজার বছরের অভ্যাসে, ঐ চাপিয়ে দেওয়া ভাবমূর্তির ভারে পিষ্ট এবং একান্তিক ভাবাদর্শের পিঞ্জরে বন্দিনী।[২৩]

শেষ পর্যন্ত অবিরত দুঃখানুভূতির মধ্য দিয়ে মুন্নাকে নির্মোহ নিরাসক্ত জীবনবোধে উত্তরণ করিয়েছেন লেখিকা। বাইশ বছর বয়সের তুলনায় মুন্না অনেক বেশি অনুভূতিপ্রবণ, জীবনসাধিকা। বাস্তব জীবনের সুখ, ঐশ্বর্য তার মনের গভীরে কোনো ছায়াপাত করতে পারেনি।

> সত্য আছে — জগতের পরপারে সত্য লুকাইয়া আছে, আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহার বাহিরে সুখ-আশা লুকাইয়া আছে, ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া সংসারের সুখ-দুঃখের বাহিরে গিয়া তবে তাহা লাভ করা যায়।[২৪]

দেখা যায় যে, জীবনের কঠিন বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মুন্না মানুষের কল্যাণ সাধনে, পরহিতব্রতে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু মুন্নার জীবনে বৈরাগ্য আসার পূর্বে সে নিষ্ঠুর স্বামীর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিল।

> স্বামী! তোমার এই চরণই আমার আশ্রয়। এ আশ্রয় সরাইয়া লইয়া তুমি কোথায় যাইবে? অন্য সৌভাগ্যবতী রমণীকে বিবাহ করিয়াছ কর, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, আমার সঙ্গের অশান্তি তোমাকে স্পর্শ নাই করুক, ইহা আমি হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটি ধূলিকণার মতও কি আমি ঐ চরণতলে ঠাঁই পাব না?[২৫]

স্বর্ণকুমারীর সময়টা এমন ছিল যখন সমাজ একদিকে প্রগতিশীলতার পথে এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে আবার রক্ষণশীলতা থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না। স্বর্ণকুমারীর মধ্যে এই দুইটি ভাবনাই কাজ করেছে। তাই দেখা যায় নিরাসক্ত মোহমুক্তির মধ্য দিয়ে মুন্নার জীবনে এক নতুন দিশার সূচনা করেও লেখিকা আবার চিরাচরিত সংস্কার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দুসমাজ বহুবিবাহ স্বীকৃত ছিল। উপন্যাসে একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে ভোলানাথ যে উক্তি করেছে তার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যভাবনার ছায়া লক্ষিত হয়।

> ...তা কে বলেছে — কিন্তু এতে যে একজনকে খুন করা হচ্ছে — সেটা কি ভাবা হয়েছে?[২৬]

সমাজে মেয়েদের সম্পর্কে যে তুচ্ছ ধারণা প্রচলিত তা বোঝা যায় কাসিমের উক্তিতে।

> ...মেয়েমানুষগুলার কথা আবার কথা! শাস্ত্র কি বলে, সেটা একবার বলতে হলো, মেয়েমানুষ আর পশু সমান।[২৭]

ভোলানাথের মধ্যে একটি সহজ সরল মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। সমাজের অসংলগ্নতা তাকে বিচলিত করে। তাঁর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গানের মধ্যে রূপকের অন্তরালে সে যুগের সমাজচিত্র উঠে এসেছে।

স্বর্ণকুমারীর জীবনে তাঁর ভ্রাতাদের একটি বড়ো অবদান রয়েছে। দুই দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জীবনের সব সংকটে দাদাদের সহায়তা পেয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ণকুমারী ও স্বর্ণকুমারী ছাড়া আর কোনো বোন জীবিত নেই তখন বৃদ্ধ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বর্ণকুমারীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—

> যতই দিন যাচ্ছে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্ছে, ততই স্নেহ-ভালবাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালবাসার মর্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না।[২৮]

'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮) উপন্যাসেও মুন্না ও মসীনের মধ্যে ভাই বোনের সৌহার্দ্যের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। কাহিনির পরিণতিতে দুই ভাই বোন পরহিত ব্রতে ও মানবজাতির কল্যাণসাধনে জীবনের পরম সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন।

> ...তাহারা এখন জাতিকুলের অতীত, মুসলমান বলিয়া হিন্দুরা তাহাদের স্পর্শ করিতে আর ভয় করে না। তাহারা সমস্ত প্রাণের সহিত আগন্তুকদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আশীর্বাদ করেন, কত ব্যথিত হৃদয় তাঁহাদের সেই পবিত্র উপদেশে শান্তি পাইয়া গৃহে গমন করে।[২৯]

'বিদ্রোহ' (১৮৯০) উপন্যাসটি অষ্টম শতাব্দীর পটভূমিতে উপস্থাপিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে জনমনে স্বাধীনতা লাভের যে তীব্র স্পৃহা জেগে উঠেছিল, 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে ভীল ও রাজপুতদের সংঘাতের মধ্যে তারই প্রতিফলন দেখা যায়।

> উপন্যাসে আদিবাসী বিদ্রোহের সমর্থক স্বর্ণকুমারীর কংগ্রেসে যোগদান নারী মনে স্বদেশী সঞ্চার এবং পরবর্তীকালে কন্যা সরলার লাঠি বন্দুকের জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিরোধিতা হয়ত রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করলেও তাঁর স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতা এবং স্বদেশপ্রেমের ঔপন্যাসিক শিল্পায়ন সম্পর্কে সংশয় থাকে না। ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসের লেখক যে বর্তমান পাদপীঠের জীবনবীক্ষা থেকেই অতীত ইতিহাস নির্বাচন ও ব্যাখ্যা করেন মিবাররাজ এবং বিদ্রোহ পড়লে তা বুঝতে অসুবিধা হয়না। আর এই ইতিহাস রচনায় তিনি যেমন মৌলিকতার পরিচয় দেন, তেমনি তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপন গুণে বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেন।[৩০]

ইংরেজ শাসনের সময় থেকেই গ্রামের মানুষকে স্বজাতীয় বৃত্তি ত্যাগ করে ধীরে ধীরে নগরকেন্দ্রিক জীবনের দিকে অগ্রসর হতে দেখা গেছে। অরণ্যের আদিবাসিরাও শিকারবৃত্তি থেকে সরে এসে কৃষিকাজকে গ্রহণ করেছে আবার তার থেকে পরিণত হয়েছে শহরাঞ্চলের শ্রমিকে। এই ধারা বর্তমান শতকেও দুর্লভ নয়। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' উপন্যাসেও দেখা যায় যে কাহারেরা তাদের প্রাচীন বেহারাবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষিকাজ গ্রহণ করেছে এবং ধীরে ধীরে নগরকেন্দ্রিক জীবনের আকর্ষণে কারখানার শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসেও ভীলরা তাদের আদি শিকারবৃত্তি পরিত্যাগ করে কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়েছে।

> জঙ্গু তাহাদের পরিধান-পরিচ্ছদ, চেহারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। জঙ্গুর সময়ে ক্ষত্রিয়-সংসর্গে ভীলদের যে কিছুই পরিবর্তন হয় নাই — এমন নহে। দেড়শত বৎসরের অধিক হইল — ক্ষত্রিয়গণ ইদর অধিকার করিয়াছেন — জঙ্গু নির্বাসিত হইয়াছেন ৪০ বৎসর মাত্র। অর্ধশতাব্দীরও পূর্ব হইতে ভীলদিগের বিশেষতঃ রাজভৃত্য ভীলদিগের — নিতান্ত সামান্য কৌপীন পরিধান এবং শীতকালে একমাত্র পশুচর্ম ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে, শীকার মাংসই তাহাদিগের একমাত্র খাদ্য না হইয়া চাষ কতক কতক আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু একেবারে এতটা পরিবর্তন জঙ্গু দেখিয়া যান নাই, তাহার চক্ষে ইহা নিতান্তই নূতন — নিতান্তই বিস্ময়জনক।[৩১]

'মিবাররাজ' (১৮৮৭) উপন্যাসে আদিবাসী ভীলরা অরণ্যকেন্দ্রিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল তা অনেক সভ্য 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে। ভীলরা ছিল শিকারজীবি এবং উৎসবপ্রিয়। বিদ্রোহ উপন্যাসে এই ভীলরাই হয়ে উঠেছে কৃষক এবং জায়গীরদারদের দাস। বিদ্রোহের আগুনের এটা অর্থনৈতিক কারণ। 'মিবাররাজ' উপন্যাসে সরল সহজ মন্দালিক গুহাকে রক্ততিলক পরিয়ে রাজা করেছিলেন। ভীলরাও বিনা দ্বিধায় গুহাকে রাজা বলে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু ধীরে ধীরে পরাধীনতার বেদনা উপলব্ধি করে নিজেদের লুপ্ত স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেতন হয়ে উঠে।

বর্তমান শতকের পূর্বে সাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমস্যা নিয়ে ভাবনা চিন্তা লক্ষ করা যায় না। সমাজে এই শ্রেণির মানুষেরা চিরকাল অবাঞ্ছিত। স্বর্ণকুমারী দেবী সমাজের পিছনে পড়ে থাকা এইসব সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা চিন্তা করেছিলেন। উন্মত্ত রাজপুত সৈন্য ভীলদের শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে ভীল মেয়েদের ভোগ্যসামগ্রী হিসেবে রাজধানীতে নিয়ে যায় কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দেয় না। সমাজে অপাঙক্তেয় হওয়াতে ভীলদের কথা গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয় না। এই নির্যাতন ও বিদ্রোহের বাস্তবতা তৈরি করেছে। বিদ্রোহী ভীল জঙ্গু স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র উপন্যাসে এক অনিবার্য চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। চল্লিশ বৎসর নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ইদরে ফিরে জঙ্গু রাজপুত অত্যাচারের প্রতিবিধানকল্পে সচেষ্ট হয়।

> মুইডা বাণ নাই ধরিলু, তবু কাজে লাগিবু। মুই বাণ না ধরি — মুইডার ছাবালরা ধরুবে — তুইরা ধরুবি — ইদরের সব ভীলডা ধরুবে।[৩২]

উপন্যাসটির ঘটনা পরিকল্পনার পশ্চাতে লেখিকার স্বাদেশিক মন সক্রিয় ছিল। ভীলবিদ্রোহের এই কাহিনির মধ্যে ভীলদের সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসী এবং রাজপুতদের সঙ্গে ব্রিটিশদের তুলনা করা যায়।

রাজা নাগাদিত্যের ভীলকন্যা সুহারের প্রতি আকর্ষণ ও তার ফলে পরিবার ও রাজ্যে অশান্তি থেকে বিদ্রোহের সৃষ্টি উপন্যাসটির উপজীব্য। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দু'শো বৎসর পূর্বে গুহা কর্তৃক মন্দালিক হত্যার সুপ্ত অসন্তোষের আত্মপ্রকাশ।

উপন্যাসে ক্ষত্রিয় রাজার সঙ্গে আদিবাসী কন্যা সুহারের বিবাহের মধ্যে দুটো জাতির সমন্বয়ের কথা চিন্তা করেছেন লেখিকা। অসবর্ণ বিবাহ তখন সমাজে প্রচলিত ছিল না। উপন্যাসের চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে নাগাদিত্য বিবাহ বিধির মধ্যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন।

রাজা বলিলেন — "মনু যে বিধি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আর এখন ধর্ম্ম-বিবাহ বলিয়া চলিত নাই, আমি সেই বিধিই পুনঃপ্রচলন করিতে চাই।[৩৩]

উচ্চবর্ণের পুরুষের সাথে নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহকে অনুলোম বিবাহ বলা হয়। মনুর মতে স্বজাতীয় কন্যার সঙ্গে বিবাহই উৎকৃষ্ট। তবে পুনর্বিবাহের ইচ্ছে হলে অনুলোম বিবাহের সমর্থন করেছেন মনু।

বাংলার সংস্কার আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় সংস্কারকেরা শাস্ত্রবচনের সাহায্যেই সেগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। রাজা নাগাদিত্যের মধ্যে লেখিকার সেই ভাবনার প্রকাশ দেখিয়েছেন। স্বর্ণকুমারীর ভাবনা আরও প্রসারিত হয়েছে আদিবাসী মেয়ের সঙ্গে ক্ষত্রিয় পুরুষের বিবাহের কল্পনা করে।

অষ্টম শতকের সমাজ ব্যবস্থায় একজন পুরুষের একাধিক বিবাহ করা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাণী সেমন্তীকে দেখা যায় যে ভীলকন্যা সুহারের প্রতি রাজার আকর্ষণকে সে মেনে নিতে পারছে না। অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য দ্বারা নারীর চেতনা মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

রাণী দেখিলেন, সত্যই রাজা তাহাকে ভালবাসেন না, কেবল তাহাই নহে, রাজা — তাহার দেবতা — বিশ্বাসঘাতক প্রতারক, এতদিন তাহাকে ছলনা করিয়া আসিয়াছেন, অসহ্য যন্ত্রণায় রাণী আকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই অসহ্য যন্ত্রণাও তাহার প্রাণে সহিল, বুঝি স্ত্রীলোক বলিয়াই সহিল।[৩৪]

প্রতাপ-কেন্দ্রিক পৃথিবীতে মেয়েরা চিরস্থায়ী অপর হয়ে নির্বাসিতের অভিধা অর্জন করেছে। অধিকাংশ মেয়ের কাছেই জীবনের সার্থকতা ছিল স্বামীকেন্দ্রিক। নারী হিসেবে তাদের যে আলাদা সত্তা রয়েছে সে সম্পর্কে কোনো চেতনা তাদের ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মেয়েদের জীবনভাবনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল স্বামীভক্তি। তাই সমসময়ের প্রেক্ষিতে স্বামীভক্তি কথাটি স্বর্ণকুমারীর অনেক উপন্যাসেই লক্ষ করা যায়।

...তিনি স্বামী, তিনি দেবতা, তিনি যাহা করেন, তাহা দোষের হইতে পারে না — ভগবান তাহার অপরাধ যেন আমার মনে না আসে, আমাকে বল দাও, আমার অপরাধ যেন ভুলিয়া তাহার মার্জনা ভিক্ষা পাই।[৩৫]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর মুখের ভাষাটুকুও নিজস্বতা হারিয়ে মান্যতার ভাষা শিখে নেয়। উপন্যাসে রাজা-রাণীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দের চিত্রটি খুব সুক্ষ্ম ও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। একদিকে রাণীর প্রতি গভীর ভালবাসা অন্যদিকে রাণীর মনে সুহার ও রাজার প্রতি সংশয় এবং সন্দেহ রাজার অহংবোধকে তীব্রতর করে কাহিনির ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আবার রাণী সেমন্তীর মধ্যে লেখিকা আত্মচেতনার জাগরণ দেখিয়েছেন ঠিক, কিন্তু প্রচলিত সমাজসংস্কার থেকে সেমন্তী মুক্ত হতে পারেনি।

আমি কে? আমার আবার মঙ্গল-আমঙ্গল কি? হউক, যাহা হইবার হউক, ভীলকন্যা রাজমহিষী হইবে হউক।[৩৬]

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিসর শূন্যতায় অভ্যস্ত ছিল নারী। তাই তাদের কাছে 'আমি'-র কোনো অস্তিত্ব নেই। সুহারের সঙ্গে রাজার বিবাহ দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে সেমন্তী চরিত্রে হিন্দু নারীর আত্মবিলোপকারী পতিপ্রেমের

নিদর্শনই ফুটে উঠেছে।

স্বর্ণকুমারীর শেষ ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস 'ফুলের মালা' রচিত হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। উপন্যাসটি স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে পরিগণিত। সেকেন্দর শাহ ও তাঁর পুত্র গায়সুদ্দিনের পারিবারিক সংঘর্ষ এবং ঘটনাক্রমে দিনাজপুরের রাজা গণেশদেব কর্তৃক বঙ্গদেশের সিংহাসন অধিকার উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপজীব্য।

> ফুলের মালায় বর্ণিত প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে স্টুয়ার্টের প্রদত্ত তথ্যাবলীর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে লেখিকা উপন্যাস মধ্যে সন-তারিখযুক্ত তথ্যসমূহ গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তাই অনুমান করা হয় তিনি হয়ত কোনো ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বন করেছিলেন বর্তমান উপন্যাস রচনার জন্য। আমাদের বিশ্বাস সেই অনুক্ত গ্রন্থটি হল চার্লস স্টুয়ার্ট প্রণীত The History of Bengal...[৩৭]

শিল্প এবং বক্তব্যের দিক থেকে 'ফুলের মালা' একটি পরিণত উপন্যাস। 'হুগলীর ইমামবাড়ী'-র মত এই উপন্যাসেও লেখিকা সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে এক উদার ধর্মবোধকে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসটির পটভূমি হল বাংলাদেশে তুর্কি আক্রমণের পরবর্তীকাল। স্বর্ণকুমারীর লেখা 'দীপ-নির্বাণ', 'মিবাররাজ', ও 'বিদ্রোহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস তিনটির পটভূমি হল রাজস্থান। 'হুগলীর ইমামবাড়ী' ও 'ফুলের মালা' উপন্যাস দুইটির ভূসংস্থান লেখিকা দেখিয়েছেন বাংলাদেশ।

'ফুলের মালা' উপন্যাসের ঘটনাবলী আবর্তিত হয়েছে রূপময়ী নারী শক্তিময়ীকে কেন্দ্র করে। লক্ষণীয় যে উপন্যাসে সেকেন্দর শাহ, গায়সুদ্দিন ও রাজা গণেশদেব এই তিনটি চরিত্রই ইতিহাস থেকে নেওয়া। শক্তিময়ী চরিত্রটি ইতিহাস বহির্ভূত। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসে এই চরিত্রটিই গুরুত্ব পেয়েছে সর্বাধিক।

> not the re-telling of great events, but the poetic awakening of the people who figured in those events. What matters is that we should re-experience the social and human motives which led men to think, feel and act just as they did in historical reality... the historical novel therefore has to demonstrate by artistic means that historical circumstances and characters existed in precisely such and such a way.[৩৮]

'ফুলের মালা'-র পূর্বে স্বর্ণকুমারী যেসকল উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার নারীচরিত্রগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও আত্মচেতনার জাগরণ দেখা গেলেও তারা কেউই পিতৃতান্ত্রিক পরিসরের বাইরে গিয়ে নারীর নিজস্ব বীক্ষণের আভাস তৈরি করতে পারেননি। 'ফুলের মালা'র শক্তিময়ীর মধ্যে একটি প্রতিবাদী নারীকে প্রথম দেখা গেল যে নিজ ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করেছে।

বাল্যসখা রাজা গণেশদেব শৈশবে ফুলের মালা পরিয়ে তাকে রাণীর মর্যাদা দিয়েছিলেন তা শক্তি বিস্মৃত হতে পারেনি। পরিণত বয়সে দেখা হবার পর গণেশদেব বিবাহিত একথা শুনে তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছে। গণেশদেবকে সে বলেছে—

> তোমাদেরই সাজে! সত্যই ত! আমরা বিশ্বাস করিব, তোমরা ছলনা করিবে। আমরা তোমাদের ধ্যানে জীবনপাত করিব; — তোমরা ফুলে ফলে মধু লুটিয়া বেড়াইবে! আমরা তোমাদের পদতলে পড়িয়া থাকিব, তোমরা দলিয়া দলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমাদের খেলা; আর আমাদের মৃত্যু।[৩৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং নারীর স্বাধীন সত্তার চেতনা লেখিকা শক্তির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

> ...কোন কর্ত্তব্য মানব কর্ত্তব্যের বিরোধী? রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দেন নাই, তাহার ভীরু স্বভাবের পরিচয় দিয়াগিয়াছেন মাত্র। এই অবিচার তাঁহার দেবনামও কলঙ্কিত। সীতা যেমন তাঁহার সহধর্ম্মিণী তেমনি তাঁহার প্রজা; তাহাকে লোকভয়ে বিনাদোষে ত্যাগ করিয়া তিনি পতির কর্ত্তব্য, রাজকর্ত্তব্য, ঈশ্বর কর্ত্তব্য, সকল কর্ত্তব্যই ভঙ্গ করিয়াছেন।[৪০]

গণেশদেবের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ক্ষমতাভিলাষের জন্যই শক্তি গায়সুদ্দিনকে বিবাহ করেছিল। কিন্তু বঙ্গেশ্বরী হওয়ার পরও তার কাছে সব বৃথা মনে হল।

> হায়! সুখ কোথায়? গণেশদেব যখন তাহার হইলেন না তখন ধনে ঐশ্বর্য্যে ক্ষমতায় তাহার কোথায় সুখ![৪১]

গণেশদেবের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে এসে প্রত্যাখ্যাতা শক্তি আত্মমর্যাদা হারায়নি।

> গণেশদেব, আমি কুলটা নহি। আত্মসম্মান সতীত্ব রক্ষার জন্যই তোমার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিলাম; তোমার নিকট দেহ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। কিন্তু সংসার যখন সে সম্মান রক্ষা করিতে চাহে না, সমাজ সম্মানই যখন তোমাদের আদর্য্য বস্তু, তখন তাহাই হউক; আমি হৃদয়ধর্ম ত্যাগ করিয়া সমাজধর্ম্ম পালন করিয়া চলিব।[৪২]

শক্তির আত্মমর্যাদাবোধ এতই প্রবল যে তার অভিঘাত প্রতিটি মুহূর্তে পাঠককে স্তব্ধ করে দেয়।

> যাহাকে ভালবাসি না, যাহাকে হৃদয় দিতে পারিনা কি করিয়া তাহার সহবাস করিব?[৪৩]

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে যে মানসিক নির্ভরতাই সবচেয়ে বড়ো তা শক্তি উপলব্ধি করেছে। শক্তির মধ্যে ঊনবিংশ শতকের নব্যভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

শক্তি তাঁর ভালবাসার অধিকার পাওয়ার জন্য একাই সংগ্রাম করে গেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যায় যে পরিস্থিতির সামনে সে ব্যর্থ হয়েছে। বিফল প্রেমের অন্তর্বেদনায় সে গায়সুদ্দিনের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে।

> আমি তোমারি হইলাম।[৪৪]

আজ থেকেও কয়েক দশক পূর্বে পিতৃগৃহে এবং স্বামীগৃহে ব্যতীত নারীর কোনো স্বতন্ত্র আশ্রয়স্থল ছিল না। গণেশদেবের কাছে আশ্রয় চেয়েও প্রত্যাখ্যাতা শক্তি শেষপর্যন্ত গায়সুদ্দিনের আশ্রয়েই ফিরে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহিনী শক্তি শেষপর্যন্ত পিতৃতান্ত্রিক পরিসরেই আত্মসমর্পণ করেছে।

উপন্যাসের প্রথম থেকেই শক্তিকে সন্ন্যাসিনীর বেশে দেখতে পাই। সেজন্য মনে প্রশ্ন জাগে যে শক্তিতো শেষপর্যন্ত সন্ন্যাসিনীর জীবনও বেছে নিতে পারত? কিন্তু সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করলেও জাগতিক জীবনের কামনা-বাসনা থেকে সে মুক্ত ছিল না। মনে হয় পরপুরুষের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার জন্যই সে সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করেছিল।

উপন্যাসের সমাপ্তিতে গায়সুদ্দিনের কারাগারে বন্দি গণেশদেবকে মুক্ত করে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছিল শক্তি।

> এতদিনে তাহার একটি বাসনা পূর্ণ হইল। একটি বাসনা, কিন্তু আজীবনের আবেগ-কেন্দ্রীভূত শেষ বাসনা! ইহার সিদ্ধিতে সে পরম সিদ্ধি লাভ করিল, ইহার সফলতায় তাহার চির-নৈরাশ্যকষ্ট মুহূর্তে অসীম আনন্দ সমুদ্রে যেন বিলুপ্ত হইয়া পড়িল।[৪৫]

এই আত্মবিসর্জন ক্ষুদ্র প্রেমকে মহান প্রেমে উন্নীত করল। পার্থিব জীবনের বাসনা লোভকে অতিক্রম করে এক নির্মোহ জীবনে সিদ্ধিলাভ করেছিল শক্তি। মানুষের মনুষ্যত্বের সাধনার দিকটাকেই লেখিকা শক্তির মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সহ স্বর্ণকুমারীর অনেক উপন্যাসেই সাধু-সন্ন্যাসীর ভূমিকার গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কর্মফল তত্ত্ব মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে থিয়সফি নিয়ে একটি নতুন চিন্তাধারা জাগ্রত হয়েছিল যেখানে বলা হত এক বিশেষ কার্যপ্রণালীতে সমগ্র বিশ্বজগত নিয়ন্ত্রিত। স্বর্ণকুমারী নিজে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অনেক উপন্যাসে ভারতীয় ধর্মের কর্মফল, নীতিব্যাখ্যা, পাপপুণ্য, প্রকৃতি ও ধর্মের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা আছে। 'ফুলের মালা' উপন্যাসেও অশান্ত শক্তির মনকে অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন এক সন্ন্যাসিনী।

গণেশদেবকে লেখিকা মানবপ্রেমিক, উদার ধর্মবোধে বিশ্বাসী এবং আত্মসংযমী করে দেখিয়েছেন। একদিকে বিবাহিতা পত্নী নিরূপমা অন্যদিকে বাল্যসখী শক্তি যাকে তিনি বাল্যকালে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছিলেন এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে গণেশদেব বিভ্রান্ত হয়েছেন।

> একদিকে শক্তিকে বিবাহ করিয়া আনিলে নিরূপমার মত কোমল লতিকার হৃদয় দলিত করিতে হয় — অন্যদিকে শক্তিকে বিবাহ না করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়, যে তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিতে হয়। তিনি এখন কি করিবেন?[৪৬]

রাজার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আধুনিক ভাবনার পরিচায়ক। শক্তির জীবনের ব্যর্থতার জন্য তিনি নিজেকে দায়ী মনে করেছেন।

> শক্তির অবস্থা গণেশদেবের হৃদয়ে কন্টকের মত বিঁধিয়াছিল। যদিও তিনি তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন — তথাপি এই ঘটনায় তিনি নিয়ত মনে মনে অপরধীর আত্মগ্লানি অনুভব করেন।[৪৭]

কিন্তু তা সত্বেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজমানসিকতা থেকে গণেশদেব নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি। শক্তির পিতৃস্বসার কলঙ্কের অপবাদ এবং সমাজের ভয়ে গণেশদেব শক্তিকে বিবাহ করেননি। অসহায় শক্তির চরম মানসিক সঙ্কটে তিনি তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে সরে এসেছেন। তাই মনে হয় সমাজ অনুশাসনের ঊর্দ্ধে তিনি উঠতে পারেননি।

'দীপ-নির্বাণ' রচনার পর ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল'। পরিবারের অভ্যন্তরে শৈশব থেকেই ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে যে বৈষম্য করা হয় এবং পরিণত বয়সে তার ফল কত ভয়ানক রূপ নিতে পারে, উপন্যাসের নায়িকা কনকের জীবনের মধ্য দিয়ে তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

> ...পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রবলতর সত্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক লিঙ্গ। পিতৃতন্ত্র চায় পুরুষ হবে আক্রমণাত্মক, স্বাধীন, নিরাবেগ; আর নারী হবে অনাক্রমণাত্মক, দমন করে রাখবে কাম, হবে অক্রিয়, সেবাশুশ্রূষা পরায়ণ, আকর্ষণীয়। সাংস্কৃতিক লিঙ্গের বিধান অনুসারে বেড়ে উঠতে হয় তাদের। বাল্যকালে তাদের লালন-পালন করা হয় এ-বিধান অনুসারে, তারা দীক্ষিত হয় এতে এবং মানবপ্রজাতি হয়ে ওঠে দুটি বিপরীত প্রাণের সমষ্টি।[৪৮]

কনক শিক্ষিতা এবং ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা। শৈশব থেকেই দেখা যায় দাদা প্রমোদের উৎপীড়ন সে নীরবে সহ্য করে এসেছে। সাধারণত ব্রাহ্ম পরিবার প্রগতিশীল এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। প্রমোদ ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য-আধুনিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

> প্রমোদ নব্য তন্ত্রাবলম্বী, তিনি বাল্য-বিবাহের বিরোধী, স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধেও স্ত্রী-পুরুষের স্বাভিমত বিবাহ ইহাঁর মনোনীত।[৪৯]

কিন্তু বোন কনক প্রমোদের পছন্দ করা পাত্র যামিনীনাথকে বিবাহ করতে রাজি না হওয়ায় তাঁর পুরুষোচিত স্বাভিমান জেগে উঠেছে।

> তোমার ইচ্ছা। বাঙ্গালীর মেয়েদের আবার বিবাহে ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? তোর ইচ্ছার উপর বিবাহের কি নির্ভর করছে? আমার ইচ্ছাই কি যথেষ্ট নয়?[৫০]

প্রমোদ ও সেই পুরুষ সমাজেরই প্রতিনিধি যেখানে মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোনো মূল্য নেই।

> কনক কখনও তাঁহার মতে অমত প্রকাশ করে নাই; কখনো একটি সামান্য বিষয়েও কনকের নিকট হইতে তাঁহার প্রতিবাদ সহ্য করিতে হয় নাই। সেইজন্য বাল্যকাল হইতেই স্বমতেই কনকের মত স্ব-ইচ্ছাতেই কনকের ইচ্ছা তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল; উহা যেন তাঁহার নায্য প্রাপ্য বলিয়া বোধ হইত।[৫১]

তখনকার শাস্ত্রশাসিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজ মনোনীত পাত্রকে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। ঠাকুরবাড়ির কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন বাঙালি নারীর জীবনে কোনো স্বাধীনতা নেই কেন? শৈশবে কনকের

পক্ষ অবলম্বনের একটি তুচ্ছ ঘটনা থেকে প্রমোদের মনে হিরণকুমার সম্পর্কে একটা সুপ্ত আক্রোশ তৈরি হয়েছিল। সেই আক্রোশই হিরণকুমার ও কনকের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনককে দেখা যায় দাদার জন্য সে আত্মসুখ ত্যাগ করছে হিরণকুমারকে বিবাহ না করে, কিন্তু প্রমোদের মনোনীত পাত্রকেও বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। এখানে তাঁর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হয়েছে।

কিন্তু নারী জাগরণের সমকালে শিক্ষিতা ব্রাহ্ম পরিবারের কন্যা কনক আরও একটু দূর হয়ত এগিয়ে যেতে পারত। কারণ বাংলার নারীপ্রগতিতে ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েদের সাহসিক ভূমিকাই বাঙালি নারীকে পথ দেখিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে পারিবারিক বিন্যাসের রক্ষণশীলতা ছিল অনেকটাই অপরিবর্তিত। নারীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখানোর বিষয়ে উদারপন্থী হলেও নারীর জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার সংকট সম্পর্কে তারা চিন্তা করেননি।

> মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া যে কেবল শিক্ষার দরকারে, এটি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ স্বীকার করতে সম্মত ছিল না। মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবারে শৃঙ্খলা রাখা। পুরুষের হাতে যেহেতু সংসারের নৈতিক দায়িত্ব থাকে না বলে গত শতকের বিশ্বাস ছিল, তাই মেয়েদের উপর অর্পিত হয়েছিল সমগ্র সমাজকে অধঃপতন থেকে উদ্ধার করার দায়িত্ব।[৫২]

শুধু শ্বশুরগৃহে নয়, পিতৃগৃহেও যে মেয়েরা অন্যায় অবিচারের শিকার হয় এ বিষয়টি স্বর্ণকুমারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। বাংলা উপন্যাসের সূচনাপর্বে কনকলতার চরিত্রটিকে নতুন সৃষ্টি বলা যায়। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী মৃত্যু মুহূর্তে তাঁর মনের রুদ্ধদ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু কনক প্রথম থেকে শেষপর্যন্তই শান্ত সমাহিত, আত্মমগ্ন। তাঁর মনের কথা জানতে পারা যায় যখন হিরণ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—

> ...বল তুমি আমাকে ভালবাস?[৫৩]

মাত্র দুটি শব্দে শুধু একবারই কনক তাঁর অন্তরের আবেগের প্রকাশ করেছে।

> কনক তার সমস্ত লজ্জা ভুলিয়া সলজ্জে অবনত মুখে বলিল — "বাসি"।[৫৪]

'ছিন্নমুকুল' প্রকাশের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'রজনী' (১৮৭৭) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। সূর্যমুখী ও ভ্রমরের স্বাধীনচিত্ততা ও প্রতিবাদের প্রকাশ হয়েছিল গৃহত্যাগে ও স্বামী সন্দর্শন প্রত্যাখ্যানে। কিন্তু ছিন্নমুকুলের নায়িকা কনকের সূর্যমুখী বা ভ্রমর হবার সাধ্য ছিল না। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ হয়েছে নিঃশব্দ রোদনে, গঙ্গায় ডুবে মরার চেষ্টায় এবং দুর্যোগের রাতে উন্মাদিনী হয়ে ছুটে বেড়ানোয়। শেষপর্যন্ত তার অচরিতার্থ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

স্বর্ণকুমারী কনকের জীবনের মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ মেয়ের গল্প শোনালেন যার জীবন নিষ্ঠুর অবিচারের মধ্য দিয়ে হারিয়ে গেল। কিন্তু লেখিকার নিজস্ব প্রতিবেদনের কোনো বার্তা তৈরি হল না উপন্যাসে।

উপন্যাসে কনকের বিপরীতে আরও একজন নারী হল প্রমোদের স্ত্রী নীরজা। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে একজন বনকন্যা রূপে নীরজার আবির্ভাব এবং পরবর্তী সময়ে সংসারের বাস্তব পরিবেশে অনায়াসে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া অনেকটাই কৃত্রিম বলে মনে হয়। উপন্যাসটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

তবে কপালকুন্ডলার মত উদাসীনতা ও বৈরাগ্য নীরজায় নেই।

নীরজা এমন একজন নারী যার চিন্তা, চেতনা, ভাষা সবই পুরুষতন্ত্রের ছায়ায় আচ্ছন্ন। অরণ্যের মুক্ত উদার পরিবেশে বেড়ে ওঠা নীরজার মধ্যে স্বাধীন চেতনার বিকাশ দেখা যায় না।

> প্রমোদের নিকট হিরণের কথা নীরজা যেরূপ শুনিয়াছিল, তাহাতে সে তাহাকে স্বামীর শত্রু ও নিতান্ত মন্দ লোক বলিয়াই জানিত। যে, তাহাদের শত্রু, মন্দ লোক বলিয়া যাহাকে তাহার ঘৃণা করে তাহাকে কনক ভালবাসিবে এ কথা মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইল।[৫৫]

একজন নারীই নারীর মনকে অনুভব করতে পারে। কিন্তু নীরজা কনকের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল না। কনকের চরম সংকটে সে কনকের পাশে এসে দাঁড়ায়নি।

> কনক পোড়ারমুখী কি প্রমোদকে কষ্ট দিতেই জন্মিয়াছিল?[৫৬]

প্রমোদের জীবনে লীন হয়ে থেকেই জীবনের সার্থকতা খুজে পেয়েছে নীরজা।

স্বর্ণকুমারীর লেখা দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস 'স্নেহলতা বা পালিতা' (১৮৯২, ১৮৯৩ দুটি ভাগে প্রকাশিত)। 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসটি লেখিকার অপরিণত বয়সে রচিত এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের রোমান্সের আবহ সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সেজন্য অনেক চমকপ্রদ, আকস্মিক বা নাটকীয় ঘটনা উপন্যাসটির বাস্তবরস ক্ষুণ্ণ করেছে। সামাজিক উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসটিতে সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের কোনো অভিব্যক্তি নেই। 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসে সমকালীন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে লেখিকার সচেতন বাস্তব মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

> অধুনা বঙ্গসমাজে যেরূপ চিন্তা, যেরূপ ভাব, যেরূপ কার্যকলাপ শতস্রোতে প্রবাহিত— তাহারই পূর্বতন চিত্র, তাহারই সূত্রপাত উক্ত সময়ে এই উপন্যাসে অঙ্কিত হইয়াছে। অতএব, যুগান্তর ব্যবধানে, বর্তমানের সহিত অতীতের যে সন্ধি, নূতন চিত্রপাতে পুরাতনের যে অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য, এক কথায়, কালপ্রবাহে সমাজের ভাব ও কার্য্য পরম্পরার যে ধারাবাহিকতা ক্রমাভিব্যক্তি স্নেহলতা পাঠে তাহা যদি নবীন পাঠক প্রত্যক্ষ করেন তবেই লেখিকার গ্রন্থ রচনা সার্থক।[৫৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির জীবনে যে পরিবর্তন ও ভাববিপ্লব ঘটেছিল তার প্রতিফলন উপন্যাসের প্রথমভাগে দেখা যায়। বিডন গার্ডেনে তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং বিধবা বিবাহের সুফল কুফল সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীদের এক গুপ্তসভার পরিচয় মিলে যার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা' বা হামচুপামূহাযোর সাদৃশ্য রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনাকালে জোঁড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব উদ্যোগের একটি ছবি আঁকা হয়েছে উপন্যাসে

> স্নেহলতার প্রথম ভাগের অষ্টাদশ পরিচ্ছদে— 'একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন' গানটি আছে; রবীন্দ্রনাথের 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানের সঙ্গে যে এর নিকট-সাদৃশ্য বর্তমান তা গীতবিতানের গ্রন্থ পরিচয়ে স্বীকার করা হয়েছে।[৫৮]

১২৯৫ সালে 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায় অঘোরনাথ দত্তের 'য়ুরোপীয় গুপ্তসমাজ' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত

হয়েছিল। পশুপতি শাশমলের 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে স্বর্ণকুমারীর বর্ণিত 'গুপ্তসভা'র কার্যকলাপের সঙ্গে অঘোরনাথের গুপ্তসভার কাজকর্মের সাদৃশ্য রয়েছে।

> সভা যে কেবলমাত্র বক্তৃতাই করেছে তা নয় নানাবিধ স্বদেশী শিল্পের প্রতি সভ্যগণ উদ্যোগী ছিলেন তার প্রমাণও আছে; কাচ, সাবান প্রভৃতি শিল্পোদ্যমের কথা গম্ভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'র লঘুতা ছিল না, এর পরিণাম হয়ত হাস্যকর, কিন্তু যে নিষ্ঠা ও ভালবাসা নিয়ে সভ্যগণ জাতীর উন্নতি সাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন লেখিকা তাকে নিয়ে কোনো রসিকতা করেননি। পরবর্তীকালে এই সভা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কৌতুক সৃষ্টি করেছেন প্রায় সমসাময়িককালে — স্বর্ণকুমারীর মনে সেইভাব জাগ্রত হয়নি,...[৫৯]

উপন্যাসটিতে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের একটি নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে। জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় নামে একজন সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকের সংসারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের ঘটনাস্রোত আবর্তিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবেই এসেছে গোটা সমাজের ছবি।

> পরিণত শক্তির ঔপন্যাসিক তাঁর সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই কাহিনীতে উপস্থিত হয়েছেন। এই উপন্যাসে ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্রগত সমস্যা পরিবারের আধারে পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু তা পরিবার বিশেষের সীমা ছাড়িয়ে সমকালীন সামাজিক বিবিধ আলোড়ন পর্যন্ত আপনাকে প্রসারিত করেছে।[৬০]

উপন্যাসের ঘটনা আবর্তিত হয়েছে স্নেহলতা নামে এক আশ্রিতা অসহায় মেয়ের জীবনকে কেন্দ্র করে।

> তাঁর 'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসের (১৮৭৯) কনক বা 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসের (১৮৯২-৯৩) স্নেহলতার জীবন জুড়ে একই অসহায়তার ছবি। এই সহিষ্ণু মেয়েদের সত্যিই বুক ফাটলেও মুখ ফোটেনা, নীরবেই ভাগ্যের সমস্ত মার, জীবনের সমস্ত অবিচার সহ্য করে তারা, অবিচারের বোঝা বইতে বইতে ফুরিয়ে যায় তাদের অচরিতার্থ ছোট্ট জীবন।[৬১]

উনিশ শতকীয় 'নবীনা' স্নেহলতা আশ্রয়দাতা জগৎবাবুর (জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়) কাছে লেখাপড়া শিখেছে।

> ... স্নেহলতা বাংলা বেশই শিখিয়াছিল, ইংরাজিও চলনসই রকম বেশ বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাই বলিয়া স্নেহ যে একরাশ বই পড়িয়াছে তাহা নয় — ... জগৎবাবুও যতক্ষণ তাহাকে কোন একখানি বই কি কাগজ আনিয়া দেন ততক্ষণে সে পড়িতে পায়। জগৎবাবুও এ সম্বন্ধে নিতান্ত মুক্তহস্ত নহেন, যেমন তেমন বই অবারিতভাবে তাহাকে পড়িতে দেন না। বাঙ্গালা মাসিক পত্র, ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, জীবনী, কখনো কখনো মাত্র ভাল ভাল দু-একখানি কাব্য উপন্যাস স্নেহলতার জন্য লইয়া আসেন; ইহাছাড়া সময় হইলে তাহার সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও নির্দ্দোষ কাব্যাদিও পাঠ করেন।[৬২]

পুরুষতন্ত্রের গায়ে যাতে কোনো আঁচড় না লাগে ঠিক ততটুকুই শিক্ষা জগৎবাবু স্নেহলতাকে দিয়েছিলেন।

> মেয়েরাও যদি পুরুষের সমান শিক্ষা পায়, তাহলে পারিবারিক কাজ ব্যাহত হবে এবং মেয়েরা দাবি করতে শুরু করবে পুরুষের সমান অধিকার। এই 'বিপর্যয়' রোধের জন্য দরকার ছিল ভক্তি, ধর্ম, নীতি ও ঘরের কাজ শেখানো।[৬৩]

তাই বিধবা হওয়ার পর পুনর্বিবাহে স্নেহলতার ঘোর আপত্তি।

> একবার বিয়ে হলে আবার নাকি বিয়ে হয়![৬৪]

বিয়েটা তাঁর কাছে পিতৃতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী ঈশ্বর নির্দিষ্ট। বিধবা হওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার বঞ্চনাকেও সে ঈশ্বরের বিধান বলেই মেনে নিয়েছে। লম্পট দেওর কিশোরীর লোলুপ নিষ্ঠুর আচরণের জন্য সে কষ্ট পায় কিন্তু প্রতিবাদী হয় না। পরিবারের অভ্যন্তরে বিধবা নারীর অবস্থা যে কত মর্মান্তিক তার একটি বাস্তব ছবি পাওয়া যায় উপন্যাসটিতে।

> ... স্বর্ণকুমারী বিধবা সমস্যাকে দেখেছেন — সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে নয় নারীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে।[৬৫]

সেজন্যই তাঁর ইচ্ছে সাকাররূপ ধারণ করেছিল 'সখিসমিতি' (১৮৮৬) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। প্রগতিশীল পরিবারের জন্মগ্রহণ করেও সমকালীন সমাজের অসহায় নারীসমাজের কথা তিনি হৃদয় দিয়ে চিন্তা করেছিলেন। সমাজে মেয়েদের পরাধীনতার জন্য অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবকেই তিনি চিহ্নিত করেছিলেন।

> সে দেশের মেয়েরা আমাদের দেশের মেয়েদের মত নিতান্তই কৃপার পাত্র হয়ে জন্মায় না, বাপের ধনে ছেলেদের মত তাদেরও একটা অধিকার আছে। তারপর বিয়ে যদি হলো, স্বামীর ধন ত আছেই। আর যারা নেহাৎ সঙ্গতিহীন, তারাও শিক্ষার গুণে নিজ জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম।[৬৬]

বিপত্নীক চারু আর বিধবা স্নেহলতাকে কেন্দ্র করে সমস্যার ঘূর্ণাবর্তের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল বিধবা বিবাহের সম্ভাবনা। আজন্মের সংস্কার ভেঙে চারুর ভালবাসায় সাড়া দিয়েছিল স্নেহলতা।

> চারু, আমি তোমার, চিরদিনই তোমার![৬৭]

লেখিকা উপন্যাসে বিধবার প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে সাহসের সঙ্গে দেখিয়েছেন। কিন্তু ততদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)-এ রোহিনীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হয়ে গেছে। সমাজনীতিকে রক্ষা করার জন্য বঙ্কিম তাঁর নায়িকাদের এগিয়ে দিয়েও মুছে দিতেন জীবন থেকে। স্বর্ণকুমারীও বঙ্কিমের পথ অনুসরণ করেই স্নেহলতাকে সরিয়ে দিলেন জীবন থেকে।

'বিবাহ' — এই ছোট্ট শব্দটির উপর নির্ভর করে মেয়েদের বাঁচামরা। স্নেহলতার জীবন তার প্রমাণ। বিধবা বিবাহ করার সাময়িক আবেগ থেকে মুক্ত হয়ে কুমারী কন্যাকে বিবাহ করেছিল চারু। সুবিধাবাদী এই পুরুষ সমাজকে ব্যঙ্গ করে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন ঃ

> সে (চারু) এখন ঘোরতর আর্য। ... হিন্দুয়ানির পক্ষে লিখিয়া দেশের হিতসাধনে তাহার বিরাম নাই। তাহার সমস্ত প্রবন্ধেরই প্রধান মর্ম এই, বিধবাবিবাহের মত

> অনার্য গর্হিত কার্য আর নাই, ইহার পক্ষে যাহার মুখ হইতে নির্গত হয় তাহাকে সমাজচ্যুত করা উচিত।[৬৮]

তবে চারুর অধিকাংশ প্রবন্ধই যে সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে ফেরত আসে সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন লেখিকা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মেকি মুখোশটাকে খুলে সমাজের প্রকৃত রূপকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন লেখিকা এই উপন্যাসে।

তাই স্নেহলতার মৃত্যুর পর জগৎবাবুর চিন্তার সূত্রের মধ্যে লেখিকার ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায়—

> স্নেহকে লেখাপড়া না শিখাইলে সে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার অদৃষ্ট বহন করিতে পারিত, আপনার অধঃপতন মৃত্যু আপনি ডাকিয়া আনিত না।[৬৯]

এই উক্তির মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ যেন ছুঁড়ে দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী। 'হিরণ্ময়ী বিধবা শিল্পাশ্রমে'র জন্য লিখিত 'নিবেদিতা' নাটকটিতে বিধবা সমস্যার কুৎসিত রূপটিকে খুলে দেখিয়েছেন লেখিকা। তবে ভাবতে অবাক লাগে যে 'সখিসমিতি' থেকে শুরু করে বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেসে যোগদান, দেশের নারী আন্দোলনের একজন অগ্রণী ব্যক্তিত্ব স্বর্ণকুমারী বিধবা সমস্যা সমাধানের কোনো পথ কেন দেখাতে পারলেন না। তিনি যে বিধবা বিবাহ অসমর্থন করতেন তারও কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। 'আর একটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধে লেখিকা এ সম্পর্কে লিখেছেন—

> অল্প বয়স্কা হিন্দু বিধবারা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া, অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষাদান ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। অনাথা বিধবাগণ এইরূপ সৎকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে সক্ষম হইলে তাঁহারা অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও সন্তুষ্ট থাকিবে। যে সকল বিধবারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে আমরা নিষেধ করিতেছি না, যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ধর্ম্মাচরণে বৈধব্যকাল অতিবাহিত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকেই এই অনুরোধ করিতেছি।[৭০]

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় 'বিধবা বিবাহ আইন' হবার পরও সমাজে খুব কম বিধবা বিবাহ হত। কারণ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বিধবা বিবাহকে মেনে নেওয়া খুব সহজ ছিল না। এমনকী বিধবাদের মধ্যেও বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রক্ষণশীল ধারণাই প্রচলিত ছিল। 'স্নেহলতা বা পালিতা' উপন্যাসটিতে লেখিকা স্নেহলতার জীবনের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে বিধবার জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন ঠিক, কিন্তু বিধবা বিবাহ বিষয়টিকে সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন। মনে হয়, লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে তাঁর এই দ্বিধাগ্রস্ততা সে যুগের সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন।

তবে পরবর্তী সময়ে স্বর্ণকুমারী যে বিধবা বিবাহ সমর্থন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বিধবা বিবাহ ও হিন্দু পত্রিকা' (ভারতী, ভাদ্র, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ) নামক প্রবন্ধে।

> বস্তুত নিজেদের নিত্যজীবনের যাহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাময়িক আত্মসুখের জন্য সনাতন শাস্ত্রবেচারার দৈনিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্মন্ন করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ

করেন না, অনাথিনী বালবিধবার বিবাহ প্রস্তাব শুনিলেই যখন তাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রক্তচক্ষু হইয়া চীৎকার করিতে থাকেন, তখন আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।[৭১]

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যখন বিধবাবিবাহ প্রচলন থাকা সত্ত্বেও কোনো অনিষ্টের কারণ হয়নি, তখন বিধবাবিবাহ শুধু বাঙালিদের জন্য বিপদজনক হবে এই যুক্তিকে তিনি হাস্যকর বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সব বিধবা পুনর্বিবাহে ইচ্ছুক নন, সেজন্য ইচ্ছুক বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকার আছে বলেই তিনি মনে করেছেন।

কনক ও স্নেহলতার ইচ্ছেপূরণ হয়েছিল 'কাহাকে' উপন্যাসের মৃণালিনীর মধ্যে। ভালবাসায় প্রেমে নারীপুরুষের সমঅধিকারের দাবি জানিয়েছিল মৃণালিনী।

যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী, স্বামী হইবার যোগ্য নহে, ...[৭২]

বঙ্কিমযুগে বসেই এমন এক নারীকে গড়ে তুললেন স্বর্ণকুমারী যে নায়িকা পুরুষের কাছে নির্বিচারে আত্মসমর্পণ করেনি।

... এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ণ অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমনি আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।[৭৩]

সমগ্র উপন্যাসটিই নায়িকা মণি বা মৃণালিনীর আত্মকথন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ পরিবেশে একজন নারীর ভালবাসার সমঅধিকারের দাবির মধ্যে অনাগত আধুনিকতার পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল।

আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্ব্বেই ভালবাসি, তিনি যে স্বামী হইবেন, এমনতর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই। কেবল তাহাই নহে, এই ভালবাসাই আমার একমাত্র প্রথম ও শেষ ভালবাসা নহে।[৭৪]

নারীর প্রেম শুধু স্বামীরই জন্য। এই প্রথাগত বিশ্বাসকে সে ভেঙে দিয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়ে সে অবলীলায় বলে গেছে সে ভালবেসেছে একাধিকবার। পিতৃতন্ত্রের প্রচলিত ছক ভেঙে সে স্বায়ত্তশাসিত মানুষ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসটি কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পটভূমিতে রচিত। এই সমাজকে লেখিকা নিজের অভিজ্ঞতায় পেয়েছিলেন।

স্বর্ণকুমারীর নিজের জীবনের সঙ্গে নায়িকার সাদৃশ্য না থাকলেও এ পরিবেশে তিনি যে খুব স্বচ্ছন্দ সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।[৭৫]

মৃণালিনী ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ পরিবেশের কাছে সমর্পিত নয়। একটি পরিণত মন নিয়ে সে বিচার করেছে নিজেকে এবং সমাজ পরিবেশকে।

... আমার স্বামীর বর্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে বর্তমানে, ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাহার জীবনের কোন ভাগ যে আমা ছাড়া ছিল বা কখনো তাহার সম্ভাবনা আছে, আমার সর্বগ্রাসী

প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, ...[৭৬]

যে সমস্ত বদ্ধমূল সংস্কার মেয়েদের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রাখত সেই সংস্কার মৃণালিনীর ছিল না। সেজন্য নিজের বয়স জানাতে সে দ্বিধা করেনি।

তবে ধরিয়া লওয়া যাক, আমার বয়স তখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবহিত।
— শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য হইতেছেন? কিন্তু আশ্চর্য হইবার ইহাতে কি আছে?
আজকাল ত এমন অনেকেই ইহার চেয়েও অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকেন,
আমিও না হয় আছি।[৭৭]

পুরুষের উদ্দেশ্যে মৃণালিনী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছে। কারণ তাঁর আইবুড়ীত্বে অবাক হবে পুরুষই, কেন না তারা ভিন্ন প্রজাতি।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ইংরেজি শিক্ষিত প্রগতিকামী পুরুষদের মধ্যে দাম্পত্য ভাবনা সম্পর্কে পরিবর্তনশীল মানসিকতা লক্ষ করা যাচ্ছিল। অসমবয়সী বিবাহের ফলে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে যে মানসিক নির্ভরতা গড়ে ওঠে না এ সম্পর্কে সচেতন ভাবনাচিন্তার প্রকাশ লক্ষিত হয়। অন্যদিকে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে বেশি বয়সে বিবাহ এবং অবিবাহিত থাকার ইচ্ছেও বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

উপন্যাসে মৃণালিনী বিবাহ-বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তে স্থির থাকা এবং প্রয়োজনে আজীবন অবিবাহিত থাকার বাসনার প্রকাশ স্বর্ণকুমারীর নারী ভাবনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

নাই বা বিয়ে হ'ল, আমি ত সেজন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।[৭৮]

মৃণালিনী যখন জানতে পারে যে তাঁর ভাবী স্বামী রমানাথ বিলেতে এক নারীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তখনই শুরু হয় তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব।

পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক দুর্বাসা মুনির ন্যায়
গর্বাহত নিরাশাক্ষুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল। তাহার
উপর নহে, নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম — কি করিয়া এমন লোককে দেবতা
মনে করিয়াছিলাম।[৭৯]

পিতৃতন্ত্র নারীকে শিখিয়েছে স্বামীভক্তির পাঠ। নারীকে বিশ্বাস করা যায় না — একথা পিতৃতন্ত্র শুরু থেকেই ঘোষণা করে আসছে। আর নারী কোনো প্রতিবাদ না করেই তা লালন করে এসেছে নিজের মজ্জায়। মৃণালিনী প্রতারককে দেবতা মনে করেনি, বরং তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে মৃণালিনীর দিদিকে দেখা যায় পুরুষের ছক অনুসারে তৈরি। মৃণালিনীর সম্মুখে সে তুলে ধরে পুরুষতন্ত্রের বাস্তব পরিস্থিতি।

সে পুরুষমানুষ, তার কি, তোর সঙ্গে না হলে এখনি অন্য আর একজন সেধে মেয়ে
দেবে, আর তোর নামে এ-থেকে এত কথা উঠবে যে, পরে বিয়ে হওয়াই ভার
হবে।[৮০]

প্রত্যুত্তরে মৃণালিনী জানিয়ে দিয়েছে বিয়েকে সে নিয়তি মনে করে না। নারীর জন্য পুরুষ যে মানদন্ড স্থির করে রেখেছে সে নারীকে হতে হবে সতীসাধ্বী, পতিব্রতা। মৃণালিনীও পুরুষের জন্য নতুন মানদন্ড তৈরি করে

...আমার স্বামীতে আমি সূর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই।[৮১]

প্রচন্ড মানসিক শক্তির অধিকারিণী ছিলেন স্বর্ণকুমারীর মণি তথা মৃণালিনী। অন্য একটি মেয়ে হোক সে ইংরেজ, যে তাঁর সমস্ত বিশ্বাস নিয়ে একজন পুরুষের প্রতীক্ষারত সেই পুরুষ যদি অন্য নারীকে প্রেম নিবেদন করে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাকে মণি স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারে না। বর্মা থেকে বিলেত বাঙালি পুরুষের অতি প্রচলিত কীর্তি বিদেশিনীর সাহচর্য উপভোগ করে দেশে ফিরে স্বদেশী রমণীকে বিবাহ। মনে হয় স্বর্ণকুমারী দেবীই প্রথম ঔপন্যাসিক যিনি সাহিত্যে এই বাস্তবকে প্রতিফলিত করে বিলেতিয়ানার মুখোশটাকে খুলে দিয়েছেন।

মণির এই প্রত্যাখ্যানে তাঁর দিদি ও ভগিনীপতি ক্ষুব্ধ হয়।

এই তোমাদের শিক্ষার উদারতা! স্বাধীনতার ফল![৮২]

স্বর্ণকুমারী দেখিয়েছেন ইঙ্গবঙ্গ সমাজ যতটা বাইরে থেকে ইঙ্গ ভেতরে ঢের বেশি সনাতনপন্থী। অর্থাৎ নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীর পিতৃতন্ত্রের রক্ষণশীল মূল্যবোধের কাছে মাথা নত করে থাকাই প্রত্যাশিত।

রমানাথকে প্রত্যাখ্যানের পর মণি মন হারার এক ডাক্তারের প্রেমে। জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির মিল দুজনকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করে।

> দিন দিন সে দেশের স্ত্রীলোকের কার্যক্ষেত্র বাড়ছে — এমন কি, পলিটিক্সে পর্যন্ত তারা হস্তক্ষেপ করেছে। পুরুষেরা এজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে ঠাট্টা তামাসা করে — অথচ আসলে এজন্য তাদের সম্মানের চোখেই দেখে, তাদের হাতেই কলের পুতুলের মত নাচে। দেশের উপর প্রতি জীবনের উপর স্ত্রীলোকের কিরূপ influence এবং এই influence সমাজের পক্ষে কিরূপ আবশ্যক, কিরূপ হিতকর, এবং এর অভাবে আমরা এ দেশে কিরূপ পশুজীবন বহন করি — সে দেশে না গেলে তা বোঝা যায় না।[৮৩]

ইঙ্গবঙ্গ সমাজে ডাক্তার বিনয়কুমার বসুর মতো মানুষকেও পাওয়া যায় যিনি বিলেতের নারীদের মতো স্বাধীনতা ভারতবর্ষের মেয়েদের ক্ষেত্রেও আশা করতেন। তাঁর উক্তির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই।

নতুন যুগের ভাবনায় ভাবিত মৃণালিনী পিতাও। মৃণালিনীর চরিত্রে শোভনশীলতা ও নম্রতার অভাবের জন্যই রমানাথের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেছে কিন্তু এখন রমানাথ এই বিয়েতে রাজি জ্যেষ্ঠা কন্যার মুখে একথা শুনে তিনি সদম্ভে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

... চন্ডালের হাতে মেয়ে সমর্পণ করব না।[৮৪]

পিতার সঙ্গে স্টিমারে ঢাকা ফিরে যাবার সময় মৃণালিনী জানতে পারে বাল্যবন্ধু ছোটুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির করেছেন বাবা। মৃণালিনী হৃদয়ে আবার তোলপাড় শুরু হয়। কারণ অতীতে ছোটু তার প্রিয় ছিল কিন্তু বর্তমানে তাঁর ভালবাসার উদ্দিষ্ট বিনয়কুমার। পিতাকে পত্র লিখে অবিবাহিত থেকে দেশসেবার স্বাধীন সিদ্ধান্তের কথা জানায়। প্রত্যুত্তরে পিতা বলেন যে আমাদের বাস্তবে বিবাহিতার দেশসেবার সুযোগ ও স্বাধীনতা অনেক বেশি। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মণি যেতে পারে না।

...আমি মর্মে মর্মে দুর্বল বঙ্গনারী, আজ্ঞাবর্তী দুহিতা। জীবন বিসর্জন দিতে পারি —

কিন্তু ইহার পরে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আত্মজলাঞ্জলি
ভিন্ন আমার উপায়ন্তর নাই।[৮৫]

স্বর্ণকুমারী বারবার মেয়েদের জীবনে বিকল্পের সন্ধান করেছিলেন। নিজ কন্যা সরলাদেবীকে অবিবাহিত রেখে দেশসেবায় নিয়োজিত করার ইচ্ছের কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু উনিশ শতকের সমাজ পরিবেশে একজন মেয়ের অবিবাহিত অবস্থায় জীবন কাটানো সহজ ছিল না। সেজন্যই লেখিকা মৃণালিনীর মধ্যে সম্ভাবনা তৈরি করেও সমাজ বাস্তবতার সামনে আর এগোতে পারলেন না। তবে ব্যক্তির উপর সমষ্টির চাপ লেখিকা মূর্ত করে দিয়েছেন শুধু একটি উপমায়—

...দুর্বল একহস্তে, লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিবার জন্য বৃথা চেষ্টায় প্রাণান্ত পরিশ্রান্তি।[৮৬]

কাহিনির অন্তে মণির জীবনে আসে অন্য অধ্যায়। সেখানে বাল্যপ্রেমিক ছোটু আর ডাক্তার মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তবু প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় মণির অন্তর।

পুরাতনের ছায়া দেখিয়াই হৃদয় নূতনে আকৃষ্ট হইয়াছে, অথবা নূতনে মুগ্ধ হইয়া
সহসা পুরাতন লাভ করিয়াছি? কাহাকে ভালবাসিতে এ কাহাকে ভালবাসিয়াছি?[৮৭]

লেখিকা একটি শিক্ষিত নারীমনকে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে। ভালবাসার পাত্র এক নাও থাকতে পারে। উনিশ শতকের নারীভাবনায় এক দুঃসাহসিক চিত্র এঁকেছেন স্বর্ণকুমারী মণিকে এমনভাবে তৈরি করে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর দীর্ঘলালিত রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় 'বিচিত্রা' (১৯২০) 'স্বপ্নবাণী' (১৯২১) এবং 'মিলনরাত্রি' (১৯২৫) এই ত্রয়ী উপন্যাস। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকার রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর উজ্জ্বল স্বাদেশিকতাবোধ — এই ত্রয়ী উপন্যাসের কর্মধারাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছে।

...সমাজের কোনো চাওয়া-পাওয়ার মাপে গড়া হয়নি তাঁর এই নায়িকা, নিজের
শক্তিতে নতুন সমাজ গড়ে নেওয়াই তাঁর স্বপ্ন; এই শেষ উপন্যাসত্রয়ে স্বর্ণকুমারী
মেয়েদের সামর্থ্যের শীর্ষ ছুঁয়েছেন তাঁর কলমে।[৮৮]

জ্যোতির্ময়ীর সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে কলকাতায় ফিরে এলে বেথুন কলেজের গ্র্যাজুয়েট সরলাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর আদর্শ তাকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

আমার জাতীয়তা যখন জাতিকে আত্মমর্যাদার কন্টকঘন সর্বাবস্থায় পথের কাঁটা
তুলে তুলে চালাতে ব্যস্ত তখন স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় হল।[৮৯]

বিলেতে ভারতীয় মেয়েদের প্রতিনিধি হয়ে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক বার্তা প্রতীচ্যের মেয়েদের শোনার আহ্বান জানিয়েছিলেন বিবেকানন্দ সরলাকে। কিন্তু সরলার অপ্রস্তুত ও সংকোচ ভাব তার সঙ্গে অভিভাবকদের অমতের জন্য তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি।

রাজকুমারী জ্যোতির্ময়ীর ঘরেও বিবেকানন্দের ছবি টাঙানো। পিতা অতুলেশ্বরের প্রমাতামহী বিচিত্রা দেবী তাঁর জীবনের আদর্শ।

> সুরঞ্জিত আকাশ-সাগর-তলে অপূর্ব্ব-আলোক-তরিণী-আরূঢ় এক শান্তিরূপা স্মিতবদনী দেবী। নয়নে তাহার প্রেমকরুণ দৃষ্টি, হস্তে সাম্য ক্ষেপণী![৯০]

সরলা দেবী ভারতীয় নারীদের জন্য 'ভারত স্ত্রী-মহামন্ডল' গড়ে তুলে তাদের আত্মিক শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে দেশের যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য কালকাতায় ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। 'বীরাষ্টমী ব্রত' পালনের মধ্য দিয়ে যুবসমাজের মধ্যে বীর্য-প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা করেছিলেন সরলা। জ্যোতির্ময়ীও একই উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যায়ামাগার, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছিলেন। 'বীরাষ্টমী ব্রত' উপন্যাসে জন্মাষ্টমী উৎসব হিসেবে পালিত হয়েছে।

> ব্যায়াম শিক্ষাতে ছেলেদের মনের তেজও কি বাড়বে? আর গভর্ণমেন্টের চোখে একদিন সেই তেজ সূর্য্য-চন্দ্রের মতই এমন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে যে, তখন আর এদের বীরত্ব অগ্রাহ্য করতে পারবে না?[৯১]

স্বর্ণকুমারীর পারিবারিক জীবনের অনেক চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

> ... স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা এখানে যতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছে অন্য কোনো উপন্যাসে ততটা হয়নি। নিজের বাল্যজীবনের সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক শিক্ষার কথা হাসির চরিত্রে প্রযুক্ত;... হাসি ও হাসির পিতা কৃষ্ণলাল এবং জ্যোতির্ময়ী ও অতুলেশ্বরের সম্পর্ক কথা চিত্রণকালে লেখিকা ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন একথা সুনিশ্চিত, কারণ এই অংশগুলি পাঠকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারীর সুন্দর সম্পর্কের কথা মনে পড়ে।[৯২]

বিচিত্রার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজা অতুলেশ্বরের অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুর শিক্ষার সাদৃশ্য রয়েছে। রাজা অতুলেশ্বর স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন এবং কন্যা জ্যোতির্ময়ীর শিক্ষাকল্পে অন্তঃপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

> বাংলা পড়িতেই কলিকাতা হইতে দুইজন শিক্ষয়িত্রী আসিলেন, ইংরাজীর জন্য স্থানীয় মিশনারী মেম দুইজন নিযুক্ত হইলেন। রাজবাটীর বালিকাগণ এবং প্রজাদিগের কন্যাও অনেকে এখানে শিখিতে লাগিল। ম্যাজিস্ট্রেট পত্নী নিজে দুই তিন দিন আসিয়া সেলাই শিখাইতেন, পুঙক্ষানুপুঙক্ষরূপে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং মাসে একবার করিয়া ছাত্রীদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন।[৯৩]

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'আমাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> আহার বিরাম পুজা অর্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্য নিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনি ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞ ঠাকুর পাঁজি পুঁথি হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নানবিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরীবৈষ্ণবী ঠাকুরাণি বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্না

ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, অতএব বাংলা ভালো জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য।[৯৪]

পরিণত বয়সে পৌঁছে ত্রয়ী উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন স্বর্ণকুমারী।

> বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বাংলার রাজনৈতিক আকাশে কালো মেঘ জমেছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগকে কেন্দ্র করে, পুঞ্জীভূত সেই বিক্ষোভ ক্রমে ক্রমে বয়কট আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনের নানা ভঙ্গিতে রূপ নিচ্ছিল, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের হিংসাত্মক রাজনীতিও অগ্রসর হচ্ছিল সমান্তরাল রেখায়।[৯৫]

সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ উপন্যাসটিকে বাস্তব পটভূমিকা দান করেছে। 'বিচিত্রা' উপন্যাসের সপ্তম পরিচ্ছেদে ইলবার্ট বিল এবং কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার কথা আছে। 'স্বপ্নবাণী'র প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্গবিভাগ, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ব্রহ্মবন্ধু উপাধ্যায়ের বক্তৃতা এবং রাখীবন্ধন উৎসবের উল্লেখের মধ্যে লেখিকার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া যায়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পথ তাঁর সমর্থন পায়নি। 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

> হত্যাকার্য্যই অমঙ্গলজনক, বোমা নিক্ষেপে হত্যার প্রয়াস ঘোরতর অমঙ্গলের সংঘটয়িতা।[৯৬]

স্বপ্নবাণীতে জ্যোতির্ময়ী ফরাসি বিপ্লব প্রসঙ্গে বলেছেন—

> সে দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শ হতে পারে না। সেই ভীম বীভৎস নিষ্ঠুরতা মনে করলেও কষ্টে-আতঙ্কে দেহের রক্ত জল হয়ে যায় আত্মা করুণায় বিগলিত আর্দ্র হয়ে ওঠে।[৯৭]

জ্যোতির্ময়ী অহিংসা মতে বিশ্বাসী।

> ...সাম্য মৈত্রীর পতাকার নীচে তখন জাতি-বিজাতি এক হয়ে যাবে, ভারতবর্ষ বিনা রক্তপাতে, অঙ্গুলি-তাড়নে তখন স্বরাজ লাভ করবে।[৯৮]

স্বর্ণকুমারীর মতো উপন্যাসের নায়িকা জ্যোতির্ময়ীও বয়কট আন্দোলনের নেতিবাচক দিকটিকে সমর্থন করেননি। জ্যোতির্ময়ীর মন্তব্যের মধ্যে তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

> ভেবে দেখ দু'বেলা দু'মুষ্টি অন্ন যেসব লোকের মেলেনা, তাঁতের দামী কাপড় কিনে পরা কি তাদের সাধ্য? তাঁত শিল্পকে উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানারও বিস্তৃত আয়োজন সফলতার জন্য ধ্বংসের চেয়ে গড়ে তোলার সাধনার প্রয়োজন চাই, নইলে বিলিতি সস্তা জিনিষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।[৯৯]

'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী লিখেছিলেন এই আন্দোলনের সফলতার জন্য ধ্বংসের চেয়ে গড়ে তোলার সাধনার প্রয়োজন। তবে যে বঙ্গবিভাগ বাঙালির মনে বৃটিশ শাসনের প্রতি বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল কিন্তু জ্যোতির্ময়ী বৃটিশ সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেনি। 'স্বপ্নবাণী'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবাদ-কনফারেন্সের আয়োজনের কথা আছে; উক্ত সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমনের সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে। 'মিলনরাত্রি'তে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেবার জন্য পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে জ্যোতির্ময়ী বলেছে—

বাঙ্গালী লোক রাজবিরোধী নয়। বৃটিশ সরকারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী অনুগত প্রজা তাহারা।[১০০]

স্বর্ণকুমারী 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' প্রবন্ধের অনুরূপ উক্তি করেছেন —

> বাস্তবিকই ইংরাজ গভর্ণমেন্ট আমাদের শত্রু নহনে, আমাদের অনিষ্ট করাই গভর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে, আমাদের মঙ্গলের প্রতিও গভর্ণমেন্ট উদাসীন নহেন। ... তবে এ গভর্ণমেন্ট আমাদের আদর্শ রামরাজ্য নহে ইহা সত্য।[১০১]

তবে তিনি সুশাসক ইংরেজের যেমন পক্ষপাতী ছিলেন তেমনি তাদের দুঃশাসনেরও সমালোচনা করেছেন।

> ...মানুষে মানুষের নিকট যে আচরণ প্রত্যাশা করে, আমরা ইংরাজের নিকট সেই আচরণটুকু চাই — প্রভু ও দাস সম্পর্কের পরিবর্তে রাজ প্রজায় বন্ধুত্বের সম্পর্কটুকু চাই।[১০২]

জ্যোতির্ময়ীর বাসনা ছিল বাঙালির আত্মশক্তি ও একতা বৃদ্ধি হয়ে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিগণিত হউক। ঠাকুরবাড়ির প্রতিটি ব্যক্তির শিল্পবোধ ছিল অসাধারণ। স্বর্ণকুমারী উপন্যাস বিদেশি মহিলা ঔপন্যাসিকদের মত ভব্যতা শিষ্টাচার সম্বন্ধে মনোযোগী ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির আদব-কায়দা এবং মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামাজিক আচার ব্যবহার তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ী-শরৎকুমারের প্রেম নিবিড় হতে পারেনি তাদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ কর্মজীবনের জন্য। স্বদেশ সেবার আন্তরিকতা ও প্রণয় আবেগের তীব্রতায় জ্যোতির্ময়ীর বাস্তব জীবনের নারী হৃদয়ের উন্মোচন হয়নি। সুজন রায়ের চক্রান্তে রাজদ্রোহী হিসেবে পিতাকে বন্দি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জ্যোতির্ময়ী বিজন রায়কে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং শরৎকুমারকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তাঁর মধ্যে প্রেমিকা নারীর অন্তর্বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠেনি।

উপন্যাসটির পরিণতি মেলোড্রামাটিক। ঈর্ষাকাতর বিজনকুমার শরৎকুমারকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশতঃ জ্যোতির্ময়ীকে গুলিবিদ্ধ করেছে। বিজন রায়ের চরিত্রটি প্রথম থেকেই গৌণ এবং নিষ্ক্রিয়। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে তার এই ঈর্ষা তাঁর চরিত্রের প্রেমানুভূতির সঙ্গে মিশে হৃদয়াবেগে জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

এই উপন্যাসে প্রেমের বিশ্লেষণ বা ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা জটিলতা পরিস্ফুটনের চেয়েও ঔপন্যাসিকের মনে স্বদেশ সেবার আদর্শ প্রবল ছিল। জ্যোতির্ময়ীর মৃত্যুর মধ্যে তাঁর অহিংস নীতি সার্থক হয়। কিন্তু কাহিনিতে বিষাদান্তক পরিণতিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য জ্যোতির্ময়ীর এই হত্যা প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি বলে মনে হয়।

ত্রয়ী উপন্যাসের পূর্ববর্তী উপন্যাস দুইটিতে (স্নেহলতা বা পালিতা, কাহাকে?) স্বর্ণকুমারী নরনারীর জীবন সমস্যা, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে রচিত শেষ উপন্যাস বিচিত্রা, স্বপ্নবাণী ও মিলনরাত্রি উপন্যাসে লেখিকা আবার ফিরে গিয়েছেন রোমান্সের কল্পজগতে। উপন্যাসের কাহিনির বিস্তার হয়েছে রাজরাজড়া, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতির জীবন নিয়ে। চরিত্রগুলির স্বদেশ চর্চার ভিত্তি-ভূমিটি বাস্তবের ভূমিতে প্রোথিত। তবে শিল্পের দিক থেকে লেখিকা 'কাহাকে?' উপন্যাসে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ত্রয়ী উপন্যাসে তার অভাব লক্ষিত হয়। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সাংসারিক ও রাজনৈতিক জীবনের মধ্যে ব্যক্তি অনুভূতির নিগূঢ় যোগ স্থাপিত

করতে সক্ষম হননি ঔপন্যাসিক।

আধুনিক পাঠকের চাহিদার উপযোগী আঙ্গিকের অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া যায় না স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসে। তবে পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খলে বন্দি মেয়েদের জীবনের রূঢ় বাস্তব চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, স্বামী-নির্বাচনের অধিকার, পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার, দেশ সেবার অধিকার সবই তিনি চেয়েছেন উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে।

ধারাবাহিকতার বিচারে, এমনকী বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথমা। স্ববিরোধিতা স্বর্ণকুমারীর মধ্যেও কখনও কখনও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সংস্কারকে অতিক্রম করে যাওয়া সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র কেউই তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। স্বর্ণকুমারীর উপরও হয়ত সামাজিক চাপ ছিল। এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর স্বকীয় চিন্তার প্রেক্ষাপটে তিনি নারীপুরুষকে সমান বলেই মনে করেছেন।

> মধুর থেকে প্রখরে পৌঁছেছে তাঁর উপন্যাসের মেয়েদের শক্তি, ঘরের কোণের মৃদু প্রদীপশিখা শেষপর্যন্ত অবগাহন করেছে জ্যোতিসমুদ্রে।[১০৩]

তথ্যসূত্র ঃ

১. সরকার, পুলককুমার (সম্পা.), 'শুভশ্রী', রামবাবু লেন (নতুনবাজার), খাগড়া, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১০৩, পৃ. ২৪।

২. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৪৯।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'জীবনস্মৃতি', বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, পৃ. ৮৭।

৪. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৬৭।

৫. তদেব, পৃ. ১৭০।

৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৬৫।

৭. তদেব, পৃ. ৯৫।

৮. তদেব, পৃ. ৯৭।

৯. তদেব, পৃ. ১৭৩।

১০. তদেব, পৃ. ১৩১।

১১. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়, ৬৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১০২।

১২. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ১৭৭।

১৩. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, 'রাজকাহিনী', সিগনেট প্রেস, কলকাতা ২৩, পৃ. ৩০।

১৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩১৪।
১৫. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২০৭।
১৬. চট্টোপাধ্যায়, মীনা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', অনুভাব, ৫. এস. আর. দাস রোড, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃ. ১৮৩।
১৭. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২১০।
১৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৩৫।
১৯. তদেব, পৃ. ৩৬৮।
২০. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ. ৮৭।
২১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৮৮।
২২. দত্ত, বিজিৎকুমার, 'বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩, পৃ. ১৬১।
২৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে', পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ. ৯০।
২৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪২৯।
২৫. তদেব, পৃ. ৪২১।
২৬. তদেব, পৃ. ৩৫৫।
২৭. তদেব, পৃ. ৩৫৬।
২৮. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'স্বর্ণকুমারী দেবী', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী, ১১০০০১, পৃ. ৪৫।
২৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৩১।
৩০. ঘোষ, পূর্বাণী, (সম্পা.), 'পুরবৈয়াঁ', পূর্বা, ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৯ পৃ. ৮৬।
৩১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৫৫।
৩২. তদেব, পৃ. ৪৫০।
৩৩. তদেব, পৃ. ৫৩৫।
৩৪. তদেব, পৃ. ৫১৬।

৩৫. তদেব, পৃ. ৫০৫।

৩৬. তদেব, পৃ. ৫০৩।

৩৭. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২২০।

৩৮. তদেব, পৃ. ১৬৭।

৩৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৭৪৯।

৪০. তদেব, পৃ. ৭৫৮।

৪১. তদেব, পৃ. ৭৭৫।

৪২. তদেব, পৃ. ৭৮৯।

৪৩. তদেব, পৃ. ৭৮৮।

৪৪. তদেব, পৃ. ৭৮৯।

৪৫. তদেব, পৃ. ৮০৯।

৪৬. তদেব, পৃ. ৭৬৮।

৪৭. তদেব, পৃ. ৭৯২।

৪৮. আজাদ, হুমায়ূন, 'নারী', আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ১৮৬।

৪৯. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পৃ. ১২০।

৫০. তদেব, পৃ. ১২২।

৫১. তদেব, পৃ. ১২১।

৫২. চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, 'অন্দরে অন্তরে', স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃ. ৭০।

৫৩. মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সংগ্রহ', দ্বিতীয় খণ্ড, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯, পৃ. ১১৮।

৫৪. তদেব, পৃ. ১১৮।

৫৫. তদেব, পৃ. ১১৫।

৫৬. তদেব, পৃ. ১৪১।

৫৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৭৩৬।

৫৮. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২৪৮।

৫৯. তদেব, পৃ. ২৫০।

৬০. গুপ্ত, ক্ষেত্র, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১০৯।

৬১. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৬৪।

৬২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৬৬৯।

৬৩. চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, 'অন্দরে অন্তরে', স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃ. ৭১।

৬৪. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৬৬৮।

৬৫. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা ৯, পৃ. ৪৪।

৬৬. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৭২৪।

৬৭. তদেব, পৃ. ৬৮৭।

৬৮. তদেব, পৃ. ৭২৮।

৬৯. তদেব, পৃ. ৭৩৫।

৭০. সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সংকলক), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৬৮।

৭১. ঘোষ, পূর্বাণী, (সম্পা.), 'পুরবৈয়াঁ', ৯০ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৯, পৃ. ৫৪।

৭২. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে?', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫।

৭৩. তদেব, পৃ. ৩৫।

৭৪. তদেব, পৃ. ১৬।

৭৫. দেব, চিত্রা, 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা ৯, পৃ. ৪৭।

৭৬. দেবী, স্বর্ণকুমারী, 'কাহাকে?', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫।

৭৭. তদেব, পৃ. ১৬।

৭৮. তদেব, পৃ. ৩৪।

৭৯. তদেব, পৃ. ৩২।

৮০. তদেব, পৃ. ৩৪।

৮১. তদেব, পৃ. ৩৫।

৮২. তদেব, পৃ. ৪৯।

৮৩. তদেব, পৃ. ৫৮।

৮৪. তদেব, পৃ. ৬৯।

৮৫. তদেব, পৃ. ৭২।

৮৬. তদেব, পৃ. ৭৩।

৮৭. তদেব, পৃ. ৮০।

৮৮. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৮৭।
৮৯. চৌধুরানী, দেবী সরলা, 'জীবনের ঝরাপাতা', রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ১৬০।
৯০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৯৩৯।
৯১. তদেব, পৃ. ৯৩১।
৯২. শাশমল, পশুপতি, 'স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য', বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পৃ. ২৬০।
৯৩. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৮৯৩।
৯৪. ভট্টাচার্য, সুতপা (সম্পা.), 'বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য', সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, পৃ. ১৭৩।
৯৫. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মৃণালের কলম', প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, পৃ. ২১।
৯৬. সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা (সংকলক), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৮৮।
৯৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পা.), 'স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাস সমগ্র ২', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৯৪৫।
৯৮. তদেব, পৃ. ৯৪৫।
৯৯. তদেব, পৃ. ৯৪৯।
১০০. তদেব, পৃ. ১০২১।
১০১. সেন, অভিজিৎ, ভাদুড়ী, অনিন্দিতা, 'স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা-সংকলন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৯০।
১০২. তদেব, পৃ. ২৯১।
১০৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা, 'মৃণালের কলম', প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০০০৪, পৃ. ২৪।